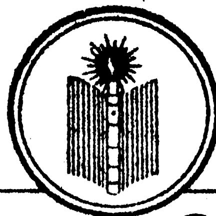
সিন্ধুদেশের প্রহরী

শ্রী প্রমথনাথ বিশী



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬২

তুই টাকা আট আনা

৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, "বাণী-শ্রী" প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

করকমলে—

ভূমিকা

ইতিহাসরসাশ্রিত এই উপন্যাসখানি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে আনন্দবাজার পত্রিকার ১৩৬১ সালের দোল সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হইল।

গুপ্তরাজগণ ও শ্বেতহূনগণ সম্পর্কিত গ্রন্থতালিকা গ্রন্থ শেষে সংযুক্ত হইল। কৌতূহলী পাঠক দেখিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত, এম. এ. গ্রন্থ তালিকাখানি সংকলন করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ রহিল।

২৮. ৩. ৫৫

কলিকাতা

সসৈন্যে আলেকসান্দর যেখানে সিন্ধুনদ পার হইয়াছিলেন সেখানে জল অগভীর। নদের মাঝখানে একটি দ্বীপ। দ্বীপে একটি পাহাড়। পাহাড়টি একটি রুক্ষ, দগ্ধ, দুর্ধর্ষ সুবৃহৎ প্রস্তর। পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহা। দ্বীপের সমতল হইতে গুহার পথ দুর্গম, সঙ্কীর্ণ; সাহসী ও সতর্ক লোকের পক্ষে একেবারে অসাধ্য নয়।

মাথায় কলসী লইয়া সকাল সন্ধ্যায় যে-সব রমণী সিন্ধুনদে জল আনিতে যাইত, উটের পিঠে বোঝা চাপাইয়া যে-সব ব্যবসায়ী ঐ পথে নদী পার হইত, দুশ্চেষ্টাপরায়ণ যে-সব পথিক ঐ পথে যাতায়াত করিত, ঐ গুহার বাহিরে পর্বত-শঙ্কুর চূড়ায় একটি দণ্ডায়মান ঋজু মনুষ্যমূর্তি তাহারা দেখিতে পাইত। উচ্চতাবশত মূর্তি পুত্তলবৎ খাটো, আর খুব সম্ভব অভ্যাসবশত মূর্তি পুত্তলবৎ স্থাণু। প্রথমে প্রথমে সকলে বিস্ময়বোধ করিত, ভাবিত ওখানে ও কে? কিন্তু দীর্ঘপরিচয়ে বিস্ময়কর আর বিস্ময় সৃষ্টি করে না। ক্রমে সকলে মনুষ্য-মূর্তিকে ঐ গুহার মতই, ঐ পর্বতচূড়ার ক্ষুদ্রতর এক চূড়ার মতই প্রাকৃতিক চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। মেয়েরা বলিত 'দেও', পুরুষেরা বলিত যোগী, শাস্ত্রজ্ঞেরা বলিত ও

মানুষ নয়, একজন যক্ষ। ঐ লোকটি ওখানে একাকী কেন, তাহার প্রাণধারণের উপায় কী, কেহ চিন্তা করিত না। দেও, যোগী ও যক্ষ সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে।

দক্ষিণায়নের প্রভাতসূর্যরশ্মি তখন শীতের কুয়াশা অপসারিত করিয়া দগ্ধ প্রান্তরের বিরল তরুগুল্মসারি প্রকাশিত করে নাই। গিরিশঙ্কুর সেই মনুষ্যমূর্তি ঋজুদেহে দিনদেবের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে দণ্ডায়মান ছিল। জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং—ধীরে ধীরে লঘু কিরণাঙ্গুলিতে একটির পরে একটি সূক্ষ্ম যবনিকা উত্তোলন করিতেছিল, প্রকৃতির, মানুষের মনের। সেই মূর্তি প্রত্যহ ঊষার সূর্যোদয়কে অভিনন্দন জানাইত, আজও জানাইতেছিল। কতক্ষণ এইভাবে সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সংবিৎ ছিল না, কখন যে তাহার মুখ দক্ষিণায়নের সূর্যকে ছাড়িয়া আরও একটু দক্ষিণে ঘুরিয়া গিয়াছে সে খেয়াল তাহার ছিল না, কখন যে তাহার মন ধ্বান্তারি সর্বপাপঘ্নের চিন্তা ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে নিবেশিত হইয়াছিল তাহাও সে ঝুঝিতে পারে নাই। মনের গতি কালের চেয়েও বেশী জটিল, বেশী রহস্যময়।

মহারাজ, এ কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত হোন।

এ কি পরামর্শ মহাদণ্ডনায়ক, আপনি মহারাজ স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের যুগের যোদ্ধা—

মহারাজ, ইচ্ছা করলে বলতে পারতেন, আমি আরও আগের যুগের লোক। মহারাজ কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের সৈন্যদলে আমি সামান্য পদাতিকরূপে প্রবেশ করেছিলাম।

তবে ?

সেই ভরসাতেই তো মহারাজকে পরামর্শ দিতে সাহসী হয়েছি। সন্ধি এক্ষেত্রে অকর্তব্য।

কেন, ভয়ে ?

না মহারাজ, অভিজ্ঞতায়।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মহাদণ্ডনায়করূপে আপনি যাদের পরাজিত করেছিলেন তাদের সম্বন্ধে কী আপনার অভিজ্ঞতা ?

জোয়ারের জল অপসারিত হলে আবার প্রত্যাবর্তন করে।

সেই জন্যেই তো বাঁধ বাঁধা আবশ্যক।

সে বাঁধ সন্ধিপত্র নয়। সৈন্যদল।

মহাদণ্ডনায়ক, আপনার চেয়ে বেশী কে জানে যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পুরাতন কালের প্রতাপ আর নেই ?

মহারাজ যথার্থভাষী। অপর পক্ষ এ তথ্য জানে বলেই তাদের এ আকিঞ্চন।

যদি জানে তবে আক্রমণ করে না কেন, সন্ধির আগ্রহ কেন ?

অযাচিত সন্ধি যে আক্রমণের ভূমিকা।

তবে আপনার উপদেশ কি ?

উপদেশ নয় মহারাজ, বৃদ্ধ অমাত্যের পরামর্শ।

কি শুনি ?

সন্ধির মধ্যে যাবেন না।

কেন ?

বিগ্রহের ক্ষেত্রে সন্ধির প্রস্তাব ওঠে, যেখানে বিগ্রহ নেই সেখানে সন্ধি অপ্রাসঙ্গিক।

ওরা তো একে মৈত্রী বলছে ?

মৈত্রী ? শত্রুরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী !

শত্রুরাষ্ট্র কে ?

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র।

কোথায় অক্ষুনদীতীরবর্তী বাহ্লীক, আর কোথায় শিপ্রানদীতীরবর্তী উজ্জয়িনী—এ কি পাশাপাশি হল ? মাঝখানে যে সহস্র যোজনের ব্যবধান।

সে ব্যবধান তো শূন্য নয়, পরাজিত হূনরাজের প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তিতে পূর্ণ।

পরাজয়ের সে শিক্ষা ওরা ভোলেনি।

মহারাজ, পরাজয়ে যদি শিক্ষা হত তবে মানুষের ইতিহাস থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ লোপ পেত। কোন্ জাতি না পরাজিত হয়েছে ?

মহাদণ্ডনায়ক, আমার বিশ্বাস সে শিক্ষা ওরা ভোলেনি বলেই মৈত্রীতে আগ্রহশীল।

মহারাজ, আমার অভিজ্ঞতা, সে শিক্ষার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসেই ওরা সন্ধিতে অগ্রসর।

বিচিত্র যুক্তি।

বিচিত্র, কিন্তু অবাস্তব নয়। যা নেই তা লঙ্ঘন করা যায় না। লঙ্ঘন করবার উদ্দেশ্যেই সন্ধিপত্রের প্রতিষ্ঠা। সন্ধিপত্রের মত সহজলঙ্ঘনীয় আর কি আছে?

লঙ্ঘন করবার দায়িত্ব আমাদের।

না মহারাজ, লঙ্ঘন করাবার দায়িত্ব ওদের।

ওরাই প্রবলতর?

না, ওরা প্রসরণশীল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাধা ওরা লঙ্ঘন করতে চায়, তাই এসেছে আজ সন্ধির পতাকা হাতে।

পতাকা যদি সন্ধির হয় তবে ভয় কিসের?

পতাকার সঙ্গে যে দণ্ডখানা যুক্ত, তার কথা বিস্মৃত হবেন না মহারাজ। বিগ্রহকালে চীনাংশুক অপসারিত, উদ্দণ্ড হবে ঐ দণ্ডখানা।

বেশ, আপনার কথা নিভৃতে চিন্তা করে দেখব।

এই বলিয়া মহারাজ বুধগুপ্ত কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন চিত্তে রাজসভা পরিত্যাগ করিলেন।

'এ কি করিতেছি, এ কি ভাবিতেছি, এ কি সন্ন্যাসীর অযোগ্য চিন্তা' ভাবিয়া হঠাৎ সেই মনুষ্যমূর্তি কপালে করাঘাত

করিয়া সবেগে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল, গুহাপ্রাকারে সংলগ্ন লৌহ-বক্ষফলকে লাগিয়া তাহার কপাল কাটিয়া যে রক্তপাত হইল, তাহা লক্ষ্য করিল না। গুহাভিত্তিতে ব্যাঘ্র-চর্ম বিস্তৃত ছিল, সেখানে গিয়া লোকটি লুটাইয়া পড়িল।

সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মহাকালেশ্বর, আমি সংসার পরিত্যাগ করেছি, সংসার-চিন্তা আমাকে পরিত্যাগ করে না কেন! মহাকালেশ্বর, আমাকে রক্ষা করো, আমাকে রক্ষা করো।

এই বলিয়া সে পাথরে মাথা কুটিতে লাগিল।

কিন্তু একবার বাঁধ ভাঙিয়া গেলে সহজে আর জোড়া লাগে না, জলের বেগে ফাটল যেমন প্রশস্ততর হয়, জলের প্রবাহ তেমনি প্রবলতর হইতে থাকে, জলের ধারা তেমনি বিস্তৃততর হইতে থাকে, অবশেষে গৃহ, শস্যক্ষেত্র সব বানের মুখে ভাসিয়া যায়।

এতদিন প্রাণপণ প্রয়াসে বিপুল বলে যে চিন্তার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল, আজ মনোযোগের ফাটল-পথে সেই সব চিন্তা দ্বিগুণ বেগে বর্তমানের প্রত্যক্ষতায় লোকটির মনে ফিরিয়া আসিল। সে ভাবিল, মহাকাল যদি আমাকে দয়া না করেন, তবে আমার কি সাধ্য এ জলতরঙ্গ রোধ করি? ভাবিল, হয় তো ইহাই মহাকালের ইচ্ছা; ভাবিল, সর্বনাশের ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া থাকিলেই কি সর্বনাশের প্রতিকার হয়? ভাবিল, আমি একা বাঁচিব আর সকলে ডুবিবে—এর চেয়ে

জঘন্য পাপ আর কী হইতে পারে? ভাবিল, আমি পাপী, পলাতক, তাই বুঝি মহাকালের আদেশে সংসার-চিন্তা পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বন্দী করিল। না, না, পালাইয়া পরিত্রাণ নাই, মহাকাল আমাকে যেখানে খুশি লইয়া যান, আমি সেখানে যাইব। ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে স্মৃতির কয়েকটি জানালা খুলিয়া গেল।

যেদিন রাজসভায় পূর্বোক্ত কথোপকথন হইয়াছিল, সেদিন সন্ধ্যায় পুষ্যভূতি মহাকালমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুষ্যভূতি দেখিলেন, স্বল্পালোকিত মন্দির-অলিন্দে এক সৌম্য বৃদ্ধ উপবিষ্ট।

পুষ্যভূতি বলিলেন, কবি, আমি জানতাম, তোমাকে এখানে পাওয়া যাবে।

কবি বলিলেন, নির্জন মন্দির কবির যোগ্য স্থান বটে।

স্থানটি নির্জন সন্দেহ নেই।

আগে এমন নির্জন ছিল না, এখন মহাকাল মহারাজের দ্বারা অবহেলিত।

পুষ্যভূতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কেবল মহাকাল অবহেলিত নন, মহাকবিও অবহেলিত।

কবি হাসিয়া বলিলেন, কেবল মহাকাল আর তাঁর

মহাকবি নন, মহাদণ্ডনায়কও অবহেলিত, আজকার রাজসভার বিবরণ সব শুনেছি।

সব শুনেছ, এখন কী উপদেশ ?

সূর্য অস্ত গেলে কি উপদেশবলে তখন আবার সূর্যোদয় ঘটে ? গৃহে দীপ জ্বাল, তখনকার উপদেশ।

তবে কি সত্যই গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তগমনোন্মুখ ?

স্পষ্টই।

তখন তুইজনে অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিলেন। শিপ্রাতীরে শিবাধ্বনি উঠিল, ওপারের বনে দক্ষিণা বাতাস মাতামাতি শুরু করিল, নদীজলে তারার ছায়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, ঝিল্লির রবে শর্বরীর কৌষেয় অংশুক অস্ফুট ফিস ফিস শব্দ করিতে লাগিল।

পুষ্যভূতি বলিলেন, মহাকবি, যে গৌরব সত্যই অস্তমিতপ্রায়, তাকে তুমি অক্ষয় আশ্রয় দাও। তুমি গুপ্ত সম্রাটগণের ইতিহাস রচনা করো।

ইতিহাস রচনা কবির ধর্ম নয়, আমি একখানা কাব্য রচনা করছি।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ?

গুপ্ত বংশের।

কী নাম দিলে ?

রঘুবংশম্।

রঘুবংশম্ !

কেন, বিস্মিত হচ্ছ কেন? পুরাতনকে অবলম্বন করে নূতনকে লিখব।

পুরাতনকে অবলম্বন করে?

বর্তমানের মধ্যে পুরাতন রয়েছে মজ্জারূপে, আবার ভবিষ্যতের মধ্যে বর্তমান রয়েছে সম্ভাবনারূপে। কাল তিনটি নয়, একটি মাত্র, মহাকাল। আমি মহাকালের অনুচর।

কিন্তু এক্ষেত্রে রঘুবংশ নামের তাৎপর্য কী?

রঘুর আগে ছিলেন অজ আর দিলীপ, তবু বংশটির প্রকৃত সূচনা ধরা হয় রঘু থেকে। গুপ্ত বংশেরও প্রকৃত সূচনা আসমুদ্রক্ষিতীশানাং—। আমার কাব্যেরও তাই, পূর্ববর্তী দুই গুপ্তরাজকে আমি বাদ দিয়েছি।

এতক্ষণে বুঝলাম। কবি, তুমি সত্যই মহাকালের যোগ্য অনুচর।

তা ছাড়া রাজাদের কথা স্পষ্ট করে বলাতে বিপদ আছে।

সন্দেহ মাত্র নেই। আজকে আমি যেটুকু বলেছি, তার পরিণাম কী হবে কে জানে।

তবেই বুঝে দেখো। এ বংশে যেমন রঘু আছেন, রামচন্দ্র আছেন, তেমনি অগ্নিবর্ণও তো আছে।

আমরা এখন কার রাজত্বে বাস করছি? অগ্নিবর্ণের কি?

বোধ করি তা-ই।

কী সর্বনাশ। ওদিকে আততায়ী শ্বেতহূনরা আবার মাথা তুলছে।

স্কন্দগুপ্তের সময়েও তো তুলেছিল। তবে তখন গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রবল ছিল, অর্থাৎ তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের জীবনতন্তু দৃঢ় ছিল, এখন কোমল হয়ে পড়েছে।

ক্ষাত্রশক্তি হীনবল হইয়াছে কথাটি মহাদণ্ডনায়কের রুচিকর বোধ হইল না, তিনি বলিলেন, বিনা সংগ্রামে তার পরীক্ষা হবে কী করে?

সংগ্রামের সূচনা মনে। মনে সে সঙ্কল্প আছে কি?

বোধ করি মহারাজের—বোধ করি অনেকেরই নেই।

আরও দেখো, বিনা সংগ্রামে জয় করবার পন্থা গ্রহণ করেছে শত্রুরা। দেশের শিথিল জীবনতন্তুর মধ্যে সুকৌশলে ওরা চালিয়ে দিয়েছে সুকোমল অঙ্গুলি।

কী যে বলো কবি, ওদের অঙ্গুলি সুকোমল?

অসি ধারণ করলেই হয়ে উঠবে সুকঠিন।

তারপর একটু নীরব থাকিয়া কবি বলিলেন, তোমাকে আর কি বলব? সবই তো জানো।

সবই জানি, সবই বুঝি অথচ করবার কিছুই নেই, এরই নাম বুঝি মর্মান্তিক দুঃখ। অসহায়ভাবে পিচ্ছিল পথে নিম্ন গমন দেখবার চেয়ে মৃত্যু ভাল। অনেক সময়ে মনে করেছি এখন সংসার ত্যাগ করবার সময় এসেছে।

তাতে কী লাভ? সবাই যদি ডোবে—একা বেঁচে কি সার্থকতা?

আবার দুইজনে নীরব। অনেকক্ষণ পরে কবি বলিলেন, চলো, ওঠা যাক। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর।

তখন তাঁহারা উঠিলেন, মন্দির ত্যাগ করিবার আগে দুইজনে সাষ্টাঙ্গে মহাকালকে প্রণাম করিয়া লইলেন।

সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্তের সিংহাসনে মহারাজ বুধগুপ্ত আজ সমাসীন। স্কন্দগুপ্তের পরে জন দুই গুপ্তসম্রাট অল্পদিনের জন্য রাজত্ব করিবার পরে বুধগুপ্ত সিংহাসন পাইয়াছেন। গুপ্ত বংশের গৌরব এখনও অটুট, কিন্তু চক্ষুষ্মানের পক্ষে বোঝা কঠিন নয় যে তাহার প্রতাপ এখন ভাটার মুখে; উজ্জয়িনীতে সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড এখনও তেমনি সক্রিয়, কিন্তু রাজ্যের সীমান্ত-অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শোণিত-প্রবাহের বেগ স্তিমিত; সে-সব স্থানে সম্রাটের আদেশ আজও পৌঁছায়, বিষয়পতি ও উপরিকগণ নতশিরে তাহা গ্রহণ করে, কিন্তু পালন করিতে তেমন উৎসাহ দেখায় না। তাহারা জানে, আদেশ কার্যে পরিণত করিবার সে ক্ষমতা সম্রাটের আর নাই। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কর্মচারিগণই প্রথমে জানিতে পারে যে, রাজশক্তি হ্রাসের পথে; তারপরে জানে বাহিরের লোকে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তেই অপচয়ের লক্ষণ সবচেয়ে পরিস্ফুট। মহারাজ স্কন্দগুপ্ত এক সময়ে আততায়ী

শ্বেতহূনগণকে সিন্ধুনদ পার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই হইতে সিন্ধুনদকে সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া তিনি দাবি করিতেন। কিন্তু সেই দাবিকে সুপ্রোথিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। রাজকীয় সচিবগণ আজও সিন্ধুনদকে সীমান্ত বলিয়া দাবি করেন, কিন্তু সিন্ধুনদ হইতে শাকল পর্য্যন্ত সুবৃহৎ অঞ্চলের রাজন্যগণ নিজেদের স্বাধীন বলিয়া মনে করেন। বস্তুত এই বিশাল ভূখণ্ড কোন অধিপতি রাজার শাসন মানে না, আধুনিক পরিভাষায় ইহা এক প্রকাণ্ড 'নো-ম্যান'স্ ল্যাণ্ড'। ভারতবর্ষের বাহিরে, উত্তর ও পশ্চিমে বাহ্লীক রাজ্যে শ্বেতহূনগণের অখণ্ড প্রতাপ, রাজার নাম তোড়মান; উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতবর্ষে গুপ্ত সম্রাটগণের রাজত্ব, আর উভয় রাজ্যের মাঝখানে পূর্বোক্ত অনির্দিষ্ট ভূখণ্ড; দুই ব্যাঘ্রের মাঝখানে অসহায় একপাল মেষ; তবে দুই ব্যাঘ্রের প্রকৃতিতে কিছু প্রভেদ আছে, একটি বৃদ্ধ ও পরিতৃপ্ত, অপরটি ক্ষুধিত ও শিকার-সন্ধানী; যাহা আছে, কোনরকমে রক্ষা পাইলেই একটি সন্তুষ্ট, আ যেন তেন প্রকারেণ, ছলে বলে কৌশলে পরস্ব হস্তগত করিবার জন্য অপরটি লালায়িত; গুপ্ত সাম্রাজ্য ও বুধগুপ্ত, শ্বেতহূন ও তোড়মান, দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ পরস্পরের সম্মুখীন; ইতিহাসের বিচিত্র গতি!

সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত বা স্কন্দগুপ্ত হইলে

বলিতেন—যুদ্ধং দেহি। কিন্তু তাঁহাদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বুধগুপ্ত তাঁহাদের বলবীর্য বা বুদ্ধির উত্তরাধিকারী নন, যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত, আর তা ছাড়া বাহ্লীক তো সহস্র যোজন দূরবর্তী। বুধগুপ্ত রাজনীতিজ্ঞ হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, শত্রুর সীমান্ত সহস্র যোজন দূরবর্তী হইলেও তাহাকে নিজ রাজ্যের সংলগ্ন মনে করিতে হইবে।

প্রাচীন অমাত্যগণ যখন তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিত, তিনি সভাকবির রচিত কুমারসম্ভবের শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেন, আমি রাজনীতি ক্ষেত্রের উমা, আমার রাজনীতি ন যযৌ ন তস্থৌ, দেখা যাক না ওরা কি করে!

মহাদণ্ডনায়ক একদিন বলিয়াছিলেন, সেই ভালো মহারাজ, কুমারসম্ভব কাব্যকেই আদর্শ গ্রহণ করুন, আর সেই পন্থা অনুসরণ করে দৈত্য বিতাড়ন করুন।

বুধগুপ্ত হাসিয়া বলিলেন, তা হলে রাজকবিকে যে আবার নূতন কাব্য লিখতে হবে, বুড়ো বয়সে তিনি পারবেন কি?

বৃদ্ধ কবি নিকটেই ছিলেন, বলিলেন, মহারাজের কীর্তির পশ্চাদনুসরণ করতে আমার লেখনী সর্বদা প্রস্তুত।

বুধগুপ্ত কথার মোড় ঘুরাইলেন, বলিলেন, সকলকে শত্রু মনে করতে গেলে সংসার অচল হয়ে পড়ে।

রাজকবি বলিলেন, সকলকে শত্রু মনে করবেন কেন?

প্রজায় প্রজায় তো বিরোধ নেই, কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাজা কখন মিত্র! বিশেষ সে রাজা যদি ঘা-খাওয়া নেকড়ে হয়।

বুধগুপ্ত বলিলেন, মহারাজ স্কন্দগুপ্তের কাছে শ্বেত-হূনগণ যে ঘা খেয়েছে, সহসা এ মুখো আর হচ্ছে না।

পুষ্যভূতি বলিলেন, মহারাজ মাপ করবেন, সাম্রাজ্যের মহাদণ্ডনায়করূপে আমাকে প্রত্যন্ত প্রদেশসমূহের সংবাদ রাখতে হয়। আমার সংবাদ এই যে, শ্বেতহূনগণের দূত তক্ষশীলা, শাকল, ময়ুরপুর পর্যন্ত নিত্য যাওয়া আসা করছে। এমন কি, শূদ্রকী দেশ পর্যন্ত তাদের দূত এসেছিল।

ক্ষতি কি?

ক্ষতি এই যে, তারা গুপ্তসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করছে।

সে তো আপনার অনুমান!

বোধ করি অনুমান নয়।

কেমন?

সে সব স্থানে আমার যে-সব বিশ্বস্ত অনুচর আছে তারাই এ সংবাদ পাঠিয়েছে।

আমার বিশ্বাস আপনার চোখে তাদের প্রতিষ্ঠা বাড়াবার উদ্দেশ্যেই তারা এ রকম সংবাদ পাঠিয়েছে। আপনারা নিরস্ত হোন। কিছু না করাই অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ রাজনীতি।

পুষ্যভূতি, রাজকবি ও অন্যান্য প্রাচীন অমাত্যগণ বুঝিলেন যে, মহারাজা সহজ পথটাই গ্রহণ করিবেন।

রাজকবি মনে মনে বলিলেন, পতনের কালে মানুষ সিদ্ধিলাভের সহজ পথ সন্ধান করে।

এমন সময়ে একজন কঞ্চুকী আসিয়া অভিবাদন করিয়া জানাইল, মহারাজ, সব প্রস্তুত।

বুধগুপ্ত বলিলেন, অমাত্যগণ, আপনারা আসুন, বিশেষ কাজে আমাকে যেতে হচ্ছে।

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সকলেই বুঝিল, কারণ সকলেই জানিত, যে মহারাজ সঙ্গীতশালায় গেলেন। সেখানে বয়স্য ও রাজনর্তকীগণ সমবেত, এখন সঙ্গীতচর্চ্চা চলিবে।

সকলে উঠিয়া পড়িল।

রাজকবি বলিলেন, সমুদ্রগুপ্তের বীণা ও অসির মধ্যে বর্তমান মহারাজা অসিকে বিদায় দিয়েছেন।

পুষ্যভূতি বলিলেন, রাজা যখন শিল্পী হয়ে ওঠেন তখন রাজ্যের সমূহ বিপদ।

রাজকর্ম যে মহত্তম, কঠিনতম শিল্পকর্ম, রাজারা একথা কবে বুঝবে?

কবি, বোধ করি তার আর সময় সেই। সীমান্তের সংবাদ সত্যই গুরুতর। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতায় শ্বেত-হূনগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ কি অনিবার্য ?

খুব সম্ভব।

মন্দর ভালো।

কেন ?

যুদ্ধ মুখোমুখী হয়, তার পরিণাম স্পষ্ট।

তবে আর কি সম্ভাবনা আছে ?

যদি সেই যুদ্ধের কারণ মনোহর বেশে আসে, তবে বুঝবার উপায় থাকবে কি ?

এমন অনুমানের হেতু কি ?

নিতান্তই অহেতুক, কবির কল্পনা মাত্র !

কবির কল্পনার চেয়ে কঠোরতর বাস্তব আর কি আছে ? এ বিষয়ে আরও কিছু শুনতে আগ্রহ রাখি।

তবে চল, আর্যা শীলবতীর গৃহে গমন করি। সেখানে নিভৃতে আলোচনা হবে। গোবৎসের মুখে দুগ্ধের মত সমবেদনশীল শ্রোতার টানে মনের গূঢ় কথা আপনি বের হয়।

তবে সেই ভালো, চল।

তখন তাঁহারা দুইজনে শিপ্রাতীরবর্তী আর্যা শীলবতীর গৃহের দিকে চলিলেন।

স্কন্দগুপ্তের পরে গুপ্তবংশের আদর্শে ও ধ্যানধারণায় কিছু পরিবর্তন হইল, এবং রাজবংশের প্রভাবে উজ্জয়িনীর সমাজেও

সেই পরিবর্তনের ঢেউ লাগিল। দাক্ষিণাত্যের প্রভাবে বিষ্ণু ও ভক্তিধর্ম উজ্জয়িনীতে আসিল। বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে দেবদাসীগণ আসিল—আর দেবদাসীগণের প্রভাব কেবল দেবমন্দিরেই অবরুদ্ধ থাকিল না। গুপ্তবংশের কুলদেবতা মহাকাল যে-পরিমাণে অবহেলিত হইতে লাগিলেন, নূতন দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেই পরিমাণে সমাদৃত হইলেন। রাজ-বংশের দৃষ্টান্তে প্রথমে নগর-প্রধানগণ, পরে সাধারণ লোকেও ভক্তিভাবে মজিল। ক্রমে ভক্তিভাবের ফলস্বরূপ নৃত্য, গীত, সাহিত্য ও কলার চর্চা বাড়িল। এক সময়ে আর্যা শীলবতী সকলের ভক্তিপাত্র ছিলেন, এখন দেবদাসীগণ সেই স্থান অধিকার করিল, তাহারা কেবল যে হৃদয়ের ভক্তির স্থানটি অধিকার করিল এমন নয়। মহারাজ বুধগুপ্ত রাজসভায় এখন কচিৎ আসেন, তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটে সঙ্গীতশালায় কলাচর্চায়। কাজেই রাজ্য শাসনের ভার প্রধানত মন্ত্রী, সচিব ও অমাত্যগণের উপরে পড়িল। তাহাদের মধ্যে যাহারা ভক্তিরসে মজিল তাহারাই রাজার প্রিয়পাত্র, তাহাদের পরামর্শই রাজা শোনেন। ফলে অনেক রাজ-হিতৈষী, অনেক প্রবীণ, বিশ্বাসী সুদক্ষ অমাত্য ও মন্ত্রী উপেক্ষিত হইলেন। অনেকেই রাজসভা পরিত্যাগ করিলেন। রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্তিগত মান-অপমানের উর্ধ্বে স্থান দিয়া যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাদণ্ডনায়ক পুষ্যভূতি।

পুষ্যভূতি অনেক সময়ে সংসার পরিত্যাগের মানস করিয়াছেন। তিনি অবিবাহিত, কাজেই সাংসারিক বাধা ছিল না। কিন্তু কোথায় যাইবেন? তিনি ভাবিতেন, যাই যদি এমন স্থানে যাইব, গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমার বাহিরে। যেখানে সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গরাজির উত্থান-পতনের ক্ষীণতম আঘাতটুকুও না গিয়া পৌঁছায়! এমন স্থান কোথাও আছে কি? গুপ্ত সাম্রাজ্য তো স্বল্পায়ত নয়। তখন তাঁহার-মনে পড়িত, মহারাজ স্কন্দগুপ্তের প্রধান সেনানায়করূপে শ্বেতহূনগণকে যখন তিনি সিন্ধুনদ পার করিয়া তাড়াইয়া দেন তখন সিন্ধুনদের মাঝখানে একটি পার্বত্য দ্বীপ দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল, সীমান্ত-রক্ষার স্বাভাবিক দুর্গম দুর্গ। এখন মাঝে মাঝে সেই দ্বীপটির কথা মনে পড়ে! এখন আর সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজন নাই, গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্ত অনেক পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়াছে। এখন তাঁহার মনে হয়, দ্বীপটি যোগীর যোগ্য ধ্যানের আসন। যেদিন তিনি মহারাজ বুধগুপ্তের আচরণে নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়েন, সেই দ্বীপটিকে স্মরণ করেন। অদৃষ্টের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন না; একাকী বসিয়া ম্লান হাসি হাসেন, ভাবেন সীমান্ত-রক্ষার দুর্গযোগ্য স্থান কি শেষে যোগীর আসন হইয়া উঠিবে? তিনি ভাবিতে চেষ্টা করেন, সৈনিকে ও যোগীতে কোথাও গূঢ় সংযোগ আছে কি?

সেই দ্বীপের গিরিশঙ্কুপৃষ্ঠে প্রাতঃসন্ধ্যায় দণ্ডায়মান সেই মনুষ্যমূর্তিকে সে অঞ্চলের লোকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিত। কেহ বলিত, উনি পাণ্ডবগণের কুলপুরোহিত ধৌম্য, পাণ্ডবগণ মহা-প্রস্থানে গেলে ধৌম্য এখানে যোগিজীবন যাপন করিতেছেন; কেহ বলিত, না, উনি একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। তাহারা পাল-পার্বণ উপলক্ষে মধু, গোধূমচূর্ণ প্রভৃতি ভোজ্য যোগীর উদ্দেশে নিবেদন করিয়া আসিত। চূড়া পর্যন্ত উঠিত না, মাঝ পথে একটা ঝরণা আছে, সেখানে নামাইয়া রাখিয়া প্রণামান্তে নামিয়া আসিত। সেই খাদ্যই ছিল যোগীর জীবন ধারণের উপায়।

একদিন উজ্জয়িনীবাসী বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, একদল বৈদেশিক লোক নগর-চত্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিচিত্র তাহাদের বেশ, দুর্বোধ্য তাহাদের ভাষা, তাহাদের নাক, চোখ প্রভৃতির ছাঁদ অজ্ঞাত ছাঁচে ঢালাই করা। তাহাদের মুখমণ্ডলে গুম্ফশ্মশ্রু নাই বলিলেই হয়। নগরবাসী আরও দেখিল, বহু ছোট ছোট অশ্বের পৃষ্ঠে মোট চাপানো। নগরবাসী ভাবিল, ইহারা সার্থবাহী ব্যবসায়ী হইবে, কিন্তু কোন্ দেশের লোক!

একজন অগ্রসর হইয়া শুধাইল, তোমরা কোথা থেকে আসছ?

ব্যবসায়ীদের দলপতি ভাঙা-ভাঙা ভাষায় বলিল, আমরা পুরুষপুর থেকে আসছি। আমরা ব্যবসায়ী!

তারপরে সে শুধাইল, এখানকার নগরপালের আবাস কোথায়?

নগরবাসী মহামাত্য সুরপালের ভবন দেখাইয়া দিল।

আগন্তুকগণ সুরপালের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন দলপতি সুরপালের সম্মুখে আভূমিনত হইয়া অভিবাদন করিয়া এক থলি সুবর্ণমুদ্রা রাখিল।

সুরপাল খুশী হইলেন। শুধাইলেন, তোমরা কে?

দলপতি বলিল, আমরা ব্যবসায়ী।

কোথা থেকে আসছ?

পুরুষপুর থেকে।

কিন্তু তোমাদের তো পুরুষপুরের অধিবাসী বলে মনে হয় না। সেখানে আমি গিয়েছি।

দলপতি বলিল, মহামাত্যের কিছুই অজ্ঞাত নয়। পুরুষপুর আমাদের ব্যবসায়ের কেন্দ্র, কিন্তু আমাদের নিবাস হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে।

ব্যবসায়ের জন্য এতদূরে এসেছ!

মহামাত্য, ব্যবসায়ীর অন্ন তো ঘরে নয়।

কিসের ব্যবসায় তোমাদের?

তখন দলপতি একটি পেটক খুলিয়া ফেলিল, আর বাহির করিল পার্বত্য জন্তুর শৃঙ্গে ও অস্থিতে প্রস্তুত নানা জাতীয় কৌটা, ছোট ছোট পেটিকা, লেখনী, মস্যাধার, হাতের ও কানের অলঙ্কার।

সুরূপাল সেগুলি হাতে লইয়া দেখিলেন, যে, জিনিস সামান্য হইলেও শিল্পকর্ম সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

তিনি বলিলেন, এসব জিনিস এখানে দুষ্প্রাপ্য নয়, লোকে তোমাদের কাছে কিনবে কেন ?

দলপতি বলিল, মূল্য সুলভ হলেই কিনবে।

কত মূল্য ?

দলপতি যে বস্তুর যে মূল্য বলিল তাহা সত্যই অভাবনীয়-রূপে সুলভ। বিস্মিত সুরপাল বলিলেন, তোমরা এত সুলভে কেমন করে দাও ?

আমরা নিজেরা পশু শিকার করি, নিজেরা এ সব তৈরি করি, তাই সুলভে দিতে পারি। বিশেষ আমাদের দেশে খাদ্য অতিশয় সুলভ।

এখন কী তোমাদের প্রার্থনা ?

আমরা এই নগরে ব্যবসায় করবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

সুরপাল দেখিলেন যে, অনুমতিদানের কোন বাধা নাই, বহু বিদেশী এখানে ব্যবসায় ও বাস করে, বিশেষ সুবর্ণমুদ্রার থলি একটি প্রকাণ্ড যুক্তি। তিনি বলিলেন, বেশ তোমরা স্বচ্ছন্দে ব্যবসা করো, কিন্তু নগরের বিধিনিষেধ পালন করে চলবে, অন্যথা দণ্ডনীয় হবে।

দলপতি আবার আভূমিনত অভিবাদন করিল এবং জানাইল যে, তাহারা নগরে নগরবাসীর মতই থাকিবে, কেবল

মহামাত্রের কৃপাদৃষ্টির প্রার্থী তাহারা। তখন আগন্তুকগণ ও দলপতি প্রস্থান করিল।

নগরপ্রান্তে শিপ্রাতীরে আর্যা শীলবতীর উদ্যানবাটিকা। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে, গৃহের অলিন্দে কবি কালিদাস, মহাদণ্ডনায়ক পুষ্যভূতি ও আর্যা শীলবতী বসিয়া ছিলেন। আর্যা শীলবতী নগরের একজন বিদুষী মহিলা, কবি কালিদাসের প্রায় সমবয়সী।

একদিকে একটি তৈলদীপ জ্বলিতেছে। এমন সময়ে নিচুল দ্রুতপদে প্রবেশ করিল, বলিল, আঃ, বিলম্ব হয়ে গেল।

এই বলিয়া সে কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল।

শীলবতী হাসিয়া বলিলেন, তুমি মেঘদূতের মেঘ, তোমার 'বক্রঃ পন্থা', উজ্জয়িনীর সৌধশিখরসঞ্চারিণীগণের মায়ায় বুঝি আবদ্ধ হয়েছিলে?

নিচুল হাসিয়া উঠিল, সকলেই হাসিতে লাগিল।

নিচুল কালিদাসের কাব্যের ব্যাখ্যাতা, কাব্যরসিক, কালিদাসের বন্ধু, পুষ্যভূতির বন্ধু, শীলবতীর বন্ধু, কাহার বন্ধু সে নয়। বোধ করি একমাত্র ব্যতিক্রম দিঙ্‌নাগ। তাহার বয়স পূর্বোক্ত তিন জনের চেয়ে কম।

যে আসনখানার উপরে তিনজন বসিয়া ছিল, দীপালোকে সেখানা দেখিয়া বিস্মিত আনন্দে নিচুল বলিয়া উঠিল, একি, কবির স্পর্শে যে শতদল প্রস্ফুটিত হয়েছে।

কালিদাস বলিলেন, নিচুল, দিঙনাগ উপস্থিত থাকলে কী সঙ্কটই না এখন উপস্থিত হত।

কেন।

রাত্রিবেলায় কহ্লার প্রস্ফুটিত হয়, শতদল নয়!

এইজন্যে? দিঙ্‌নাগ কেবল দিনের সূর্যকেই জানেন। আমাদের কবি দিবারাত্রির সূর্য।

তারপর সে শীলবতীর দিকে তাকাইয়া শুধাইল, আসনখানা আগে তো দেখিনি, কত মূল্য লাগল?

শীলবতী বলিলেন, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, বিলম্ব কেন?

তবে শুনুন। উজ্জয়িনীর সৌধশিখরসঞ্চারিণীদের অনুরোধে নয়, শ্বেতহূন রমণীদের নৃত্যোৎসব ছিল, তাই বিলম্ব!

কেমন লাগল? সুন্দর?

সুন্দর কিনা জানিনে, নূতন।

এবারে কালিদাস বলিলেন, নূতনত্ব যখন সৌন্দর্যের স্থান অধিকার করে তখন বিপদ।

কার? শিল্পের?

শিল্পের, শিল্পীর, সমস্ত সমাজের।

তবে সমাজপতিকে দায়ী করুন। স্বয়ং মহারাজ সে উৎসবে অগ্রণী।

শীলবতী বলিলেন, মহারাজের পিণ্ডখর্জুর খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, এখন তাই তিন্তিড়িতে আগ্রহ।

কালিদাস বলিলেন, পরিণাম সমান শোকাবহ।

কার পক্ষে? শকুন্তলার?

এবারকার শকুন্তলা কণ্বদুহিতা নয়, সসাগরা পৃথিবীর গুপ্ত সম্রাটগণের রাজ্যশ্রী।

সকলে একটু নীরব হইবামাত্র নিচুল বলিল, আর্যা, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

কত মূল্য এই তো? কত অনুমান হয়?

অন্তত পঞ্চাশ মুদ্রা।

সেই মূল্যে এখানা নিতে রাজি আছ?

কম মনে হচ্ছে। চল্লিশ? কী, তারও কম? তবে ত্রিশ? না, তার কম কিছুতেই হতে পারে না।

শীলবতী হাসিয়া বলিলেন, মাত্র দশ মুদ্রা!

দশ মুদ্রা! অসম্ভব। কোন্ বিপণিতে ক্রীত?

চত্বরের যে বিপণিতে সবচেয়ে বেশী ক্রেতার ভিড়, সেই শ্বেতহূনদের বিপণি থেকে—

নিচুল বলিল, ওরা কি ব্যবসা করে, না দানসত্র খুলেছে?

এতক্ষণ পুষ্যভূতি নীরব ছিলেন, এবারে কথা বলিলেন, তুমি আসবার আগে সেই বিষয়েই আমরা চিন্তা করছিলাম, ওরা ব্যবসায় করতে এসেছে, না দানসত্র খুলতে এসেছে, না আর কোন উদ্দেশ্যে এসেছে।

নিচুল বলিল, তা জানিনে, কিন্তু ওদের মতো সুলভে কেউ দিতে পারে না, অন্যান্য ব্যবসায়ীরা সঙ্কটে পড়েছে।

মহারাজকে সে কথা নিবেদন করেছিলাম।

তিনি কী বললেন?

মহারাজ বললেন, ওরা যদি পারে আমি নিষেধ করব কেন? আমি বললাম, অপরে যে অপারগ। তা শুনে মহারাজ বললেন, ব্যবসায়ের মূল নীতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমি বললাম, মহারাজ, এ যে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তিনি শুধালেন, এমন কেন বলছেন মহাদণ্ডনায়ক? আমি বলি, এখানকার ব্যবসায়ীরা স্বগৃহে বসে যে দামে দিতে পারছে না, ওরা অন্য দেশ থেকে এখানে এসে তার চেয়ে সুলভে দিচ্ছে, এর মধ্যে কোথাও একটা অন্যায় আছে, সেই জন্যেই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলছি। মহারাজ বললেন, ওদের দেশে সব অত্যন্ত সুলভ। আমি বললাম, মহারাজ, সে কথাও তো ওদের মুখেই শোনা। তিনি বললেন, ওরা মিথ্যা বলতে যাবে কেন? আমি বললাম উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ মিথ্যা বলে না। তিনি বললেন, কী সেই উদ্দেশ্য? বললাম, মহারাজ, সেই বিষয়টাই তো আলোচনার যোগ্য। মহারাজ বললেন, এতে কিছু আলোচ্য নেই, মহাদণ্ডনায়ক, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা কপটাচারী, আমাদের দেশের লোকেরা অকর্মণ্য, তাই তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাচ্ছে।

নিচুল বলিল, মহারাজ দেখছি বিদেশীদের প্রতি বড় সদয়।

কালিদাস বলিলেন, দেশের রাজা যখন নিজ প্রজার চেয়ে

অপর দেশের প্রতি অধিকতর সদয় হন, তখন বুঝতে হবে অশ্লেষার আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে।

পুষ্যভূতি বলিলেন, শুধু দেশের রাজা কেন? নগর-প্রধানদের মধ্যে অনেকেই বিদেশীদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল।

নিচুল। কোন্ আদর্শের প্রেরণায়?

বৃদ্ধ মহাদণ্ডনায়ক দীর্ঘ জীবনে সমাজের অনেক উত্থান-পতন, মানুষের অনেক উন্নতি-দুর্গতি দেখিয়াছেন, আদর্শবাদের নামে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, নিচুল, আদর্শবাদ তখনই সক্রিয় হয় যখন সঙ্গে সুবর্ণ থাকে।

মানে?

নগর-প্রধানগণের অনেকেই বিদেশীদের অর্থে অনুগৃহীত।

উৎকোচ?

নামে নয়, কাজে বটে। আমার কাছেও সুবর্ণের উপঢৌকন এসেছিল। আমি বললাম, মহারাজের অনুগ্রহে আমার অভাব নেই। তখন তারা বললে, সে কথা জানি, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের দান। আমি বললাম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তস্করকে আবেদন জানানো হয়। তারা ফিরে গেল, কিন্তু নিশ্চয় জানি তারা আবার আসবে। নিচুল, সুবর্ণের চেয়ে বেশী শক্তিশালী যুক্তি সংসারে অল্পই আছে। বিশ্বাস না হয়, সু-বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী মহাকবিকে জিজ্ঞাসা করো।

কালিদাস বলিলেন, আমার অভিজ্ঞতাও অনুরূপ।

ওদের প্রতিনিধি এল আমার কাছে, বলল, মহাকবি, আপনার কুমারসম্ভব কাব্য আমাদের দেশে ঘরে ঘরে পঠিত হয়। আমি শুধালাম, তোমরা সংস্কৃত জানো নাকি? সে বলল, জানতাম না, আপনার কাব্য পড়বার জন্যে আমরা সংস্কৃত শিখে নিয়েছি। তারপরে সে ব্যক্তি বলল, একবার শ্বেতহূনদের পরাজয়-কাহিনী লিখে আপনি অমর হয়েছেন, আর একবার অমরত্ব অর্জন করুন শ্বেতহূনদের সঙ্গে আর্যাবর্তীয়দের মিলনকাহিনী রচনা ক'রে। আমি বললাম, একটা অমরত্বের ভারই সহ্য করবার শক্তি নেই, আবার দ্বিতীয় অমরত্ব! ওরা জানাল যে, তরুণ কবিদের অনেকেই ঐ বিষয় নিয়ে লিখছে। আমি বললাম, তবে ওদের অমরত্ব দান করগে—ওদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই কথা শুনে ওরা হেসে এক পেটিকা সুবর্ণমুদ্রা পায়ের কাছে রাখল। আমি বললাম, এ কি? ওরা বলল, সুবর্ণ। আমি হেসে বললাম, এতে কি হবে? আমি যে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ সু-বর্ণ-ব্যবসায়ী। শুনে ওরা আর একবার হাসল এবং প্রস্থানে উদ্যত হল। আমি বললাম, ওকি, পেটিকা নিয়ে যাও। শুনে ওরা তৃতীয়বার হেসে পেটিকা নিয়ে প্রস্থান করল। বন্ধু নিচুল, যদি বিশ্বাস না হয়, সু-বর্ণের শ্রেষ্ঠতম খনি আর্যা শীলবতীকে জিজ্ঞাসা করো।

এবারে আর্যা শীলবতী শুরু করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার কাছে এসেছিল কয়েকজন শ্বেতহূনিকা তরুণী। এসে

জানাল যে দেশে থাকতেই তারা উজ্জয়িনীর নৃত্যকলার গুণ শুনেছে, এবারে তারা শিখতে চায়। আমি বললাম, ও চর্চা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি, তোমরা দেবদাসীদের কাছে যাও। তারা বললে, দেবদাসীদের নৃত্য ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, ও তাদের অভিপ্রায়সিদ্ধ নয়। জানাল, তারা শিখতে চায় সেই নৃত্য যে নৃত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য মানব-বন্দনা। আমি বললাম, তবে তোমরা ভুল জায়গায় এসেছ। আমার নৃত্য দেবতার উদ্দেশে প্রণতি। ওরা বলল, আপনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করব, আপনার কাছে দেবতা হচ্ছে মানুষ। আমি বললাম, আবার ভুল করলে, আমার কাছে মানুষ হচ্ছে দেবতা। শুনে তারা বলল, আমাদের নৃত্যোৎসবে কবে যাবেন? আমি বললাম, আমার আর উৎসবের বয়স নেই। ওরা বলল, আপনার চেয়ে অনেক বেশী প্রবীণ ব্যক্তি গিয়ে থাকেন। বললাম, তবে তাঁরা প্রবীণ নন। তারা বলল, বৃদ্ধ? বললাম, না বালক। শুনে তারা হেসে এক পেটিকা অলঙ্কার বের করল। বলল, উপহার। বললাম, অলঙ্কার পরবার বয়স গিয়েছে। শুনে তারা নারীচিত্ত-জয়ের শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করল। বলল, আপনার বয়স এমন আর কি বেশী? খুব হবে তো ত্রিশ। আমি হেসে বললাম, নাৎনী এবার এস, আমার পূজা আহ্নিক আছে। শুনে তারা এসে রত্ন-পেটিকা রেখে দ্রুত প্রস্থান করল।

কোথায় সে পেটিকা?

ঐ শিপ্রাগর্ভে! কি, নামতে ইচ্ছা করছে নাকি?

নিচুল বলিল, কী আপদ, আমি কি স্বর্ণালঙ্কারের কাঙাল? একখানা বর্ণালঙ্কার রচনা করতে পারতাম মহাকবির মতো!

নিচুলের পরিহাসে কেউ যোগ দিল না, বিষয়ের গাম্ভীর্যে সকলের মন ভারাক্রান্ত ছি.। নিচুলও নিজের ভুল বুঝিল, অবস্থা বুঝিয়া লইল, বলিল, গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুই সুদৃঢ় স্তম্ভ মহাদণ্ডনায়ক পুষ্যভূতি আর মহামাত্য সুরপাল, যতক্ষণ এ দুজন অনমনীয় আছেন, কোন ভয় নেই।

পুষ্যভূতি বলিলেন, সুরপাল বুঝি আর তেমন অনমনীয় নন।

কী সর্বনাশ! তিনিও কি তবে—?

তাহার বাক্য শেষ হইবার আগেই পুষ্যভূতি বলিলেন, তিনি নন, তাঁর পুত্র নরপাল।

নরপাল কী করেছেন?

শ্বেতহূনদের রসে মজেছেন।

তাতে ক্ষতি কি?

এ সর্বনাশা রস, গাছের রসের মতো নীচে থেকে উপরে ওঠে, পুত্র থেকে পিতায় পৌঁছয়, পিতা থেকে পৌঁছয় পিতামহে; নরপাল থেকে পৌঁছেছে সুরপালে।

পুষ্যভূতির উক্তিতে কালিদাস ও শীলবতী কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, তাঁহারা সমস্তই জানিতেন। নিচুলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

পুষ্যভূতি বলিতে লাগিলেন, সুরপাল এখন শ্বেতহূনগণ সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়, ওটা সক্রিয়তার ঠিক পূর্বাবস্থা, কাজেই তাঁর উপরে আর ভরসা রেখো না।

মহারাজ কি সব জানেন?

রাজা জানেন চোখ মুখ হাত পা নাক কান দিয়ে। তারা যা জানাচ্ছে তিনিও তাই জানছেন। ও-গুলো এখন হূনরসে রসিত।

তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

অতঃপর সকলে চুপ করিল, কেহ কোন কথা বলিল না, আর বলিবার আছেই বা কি?

রাত্রি অনেক হইয়াছিল, সকলে নীরবে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল, আর্যা শীলবতী সুদূরবর্তী একটি নক্ষত্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

মহারাজ বুধগুপ্তের কাছে শ্বেতহূনগণের পক্ষ হইতে যে মৈত্রী প্রস্তাবের পূর্বাভাস আসিয়াছিল, আগে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এবারে আর আভাস নয়, শ্বেত-হূনাধিপতি তোড়মানের কাছ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে মৈত্রী-প্রস্তাব আসিল।

মহারাজ বুধগুপ্ত রাজসভায় সে-পত্র পাঠ করিয়া প্রধান অমাত্যগণের অভিমত জানিতে চাহিলেন।

পুষ্যভূতি বলিলেন, মহারাজ, আমার অভিমত আগেই জ্ঞাপন করেছি।

বুধগুপ্ত। আপনি মৈত্রী চান না?

পুষ্যভূতি। আমি অমৈত্রীও চাই না।

সুরপাল। এ দুই ছাড়া আর কি আছে?

পুষ্যভূতি। তদবস্থভাব, অর্থাৎ যেমন চলছে তেমনি চলুক।

সুরপাল। কিন্তু মৈত্রীতে ক্ষতি কি?

পুষ্যভূতি। তদবস্থাতেই বা ক্ষতি কি?

সুরপাল। অনিশ্চয়তা।

পুষ্যভূতি। রাষ্ট্রনীতিতে নিশ্চয়তা কখন?

সুরপাল। কিন্তু সেটাই কি বর্জ্জনীয় নয়?

পুষ্যভূতি। না, নিশ্চয়তা আনে কর্মবিমুখতা, কর্মবিমুখতা আনে আলস্য, আলস্য আনে আরামপ্রিয়তা, আরামপ্রিয়তায় পতন।

সুরপাল। অপর পক্ষে মৈত্রীতে আনে শান্তি, শান্তিতে আনে সৈন্যসংখ্যার হ্রাস, সৈন্যসংখ্যার হ্রাস আনে যুদ্ধব্যয়ের সঙ্কোচ, যুদ্ধব্যয়ের সঙ্কোচে আনে প্রজাকল্যাণের অর্থ।

পুষ্যভূতি। যুদ্ধব্যয়ের সঙ্কোচে আনে উদ্বৃত্ত অর্থ, সে অর্থের গতি বিলাসে আর ব্যসনে।

সুরপাল। প্রজাকল্যাণে নয় কেন?

পুষ্যভূতি। প্রজার সহযোগিতা আবশ্যক বলেই প্রজা-

কল্যাণ কাম্য। যেখানে অসাড় নিশ্চয়তা সেখানে প্রজা-কল্যাণ কাম্য হতে যাবে কেন ?

বুধগুপ্ত। অন্তত যুদ্ধের বিপদ তো দূর হবে ?

পুষ্যভূতি। মহারাজ, বিপদ কি কেবল যুদ্ধেরই ?

বুধগুপ্ত। তবে শ্বেতহূনগণ মৈত্রীতে এত উৎসুক কেন ?

পুষ্যভূতি। সেই তো জিজ্ঞাসা, ওদের আগ্রহের কারণ কি ?

বুধগুপ্ত। আপনিই বলুন।

পুষ্যভূতি। যুদ্ধে পরাস্ত হলেই মনের হিংসা দূর হয় না। হিংসার নানা আকার, নানা পথ। পরাজিত শ্বেতহূনগণ এবার মৈত্রীপথ অবলম্বন করেছে। রাজনৈতিক মৈত্রী ছদ্মবেশী হিংসা।

বুধগুপ্ত। কিন্তু ঐ যে শ্বেতহূন ব্যবসায়িগণ এতকাল উজ্জয়িনীতে বাস করছে, ওদের তো হিংস্র বলে মনে হয় না। কেমন বিনীত বশংবদ, কেমন অমায়িক, মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

পুষ্যভূতি। হাঁ মহারাজ, অসিতে সূর্যালোক পড়লে যে রকম হাসি বিচ্ছুরিত হয়।

বুধগুপ্ত তখন অন্যান্য অমাত্যগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখা গেল যে অধিকাংশ অমাত্যই মৈত্রীর পক্ষে, কেবল মহাদণ্ডনায়ক ও দু'চারজন প্রবীণ অমাত্য 'তদবস্থা'র পক্ষে।

বুধগুপ্ত বলিলেন, দেখলেন মহাদণ্ডনায়ক, অধিকাংশ অমাত্যই মৈত্রীর অনুকূল।

পুষ্যভূতি কোন উত্তর দিলেন না।

বুধগুপ্ত ঘোষণা করিলেন যে, তিনি শ্বেতহূন-পক্ষের মৈত্রী-প্রস্তাব স্বীকার করিবেন।

তখন মহাদণ্ডনায়ক গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, এবার আমাকে বিদায় দিন।

বোধ করি এই অনুরোধে বুধগুপ্ত মনে মনে খুশীই হইলেন। তিনি পুষ্যভূতির পূর্বকীর্তির অনেক গুণগান করিলেন, কিন্তু সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না।

মহাদণ্ডনায়ক মহারাজকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

পরদিন প্রাতে পুষ্যভূতি উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিবেন। আজ সন্ধ্যায় শেষবার তিনি কালিদাস নিচুল ও শীলবতীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, শীলবতীর কুটীরে। ইঁহারা চারজনে গৌরবোজ্জ্বল উজ্জয়িনীর, সমুদ্রগুপ্ত কুমারগুপ্ত স্কন্দগুপ্তের উজ্জয়িনীর শেষ সার্থক সাক্ষী।

নিচুল বলিল, তবে কি এই পথেই গুপ্তবংশের লক্ষ্মী অন্তর্ধান করবেন?

কালিদাস বলিলেন, এই-পথ সেই-পথ নয়, পথ একটিই। সমস্ত বংশের লক্ষ্মী এই একই পথে অন্তর্ধান করেন।

নিচুল। বাধা দেওয়ার কেউ নেই?

কালিদাস। জানবে কি করে? লক্ষ্মীর অন্তর্ধানের সঙ্গে তো তাঁর রত্নসিংহাসন অন্তর্হিত হয় না, লোকে সেই সিংহাসনকেই দেবী প্রতিমা মনে করে নিশ্চিন্ত থাকে।

শীলবতী শুধাইলেন, আপনি কোথায় যাবেন পুষ্যভূতি?

পুষ্যভূতি। তা জানি নে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও। খুব সম্ভব, সিন্ধুনদের তীরে কোন নির্জন স্থানে।

কালিদাস। সেই ভালো, মহাদণ্ডনায়ক হবেন এবারে সিন্ধুনদের মহাপ্রহরী।

পুষ্যভূতি। হয় তো মিথ্যা নয়, মহাসঙ্কটের মহাপ্রহরী।

কালিদাস। কে জানে, হয় তো তোমাকে দিয়ে আরও কছু করিয়ে নেবেন মহাকাল।

পুষ্যভূতি। কিন্তু আমি তো স্থির করেছি বানপ্রস্থ্য অবলম্বন করে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করব।

কালিদাস। হয়তো আবশ্যক আছে সাম্রাজ্যরক্ষায়, মহাকালের এক হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, অপর হাতে যে ত্রিশূল।

পুষ্যভূতি। কিন্তু আমি যে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি।

কালিদাস। মহাকাল নিজেও তো তরুণ নন।

পুষ্যভূতি। তোমরা তিনজনে থাকলে এখানে—

কালিদাস। থাকলাম; আর যতদিন জীবিত থাকি, সন্ধ্যাবেলায় এখানে মিলিত হব আর আলোচনা করব সাম্রাজ্যের উত্থানপতন-কাহিনীর।

পুষ্যভূতি। কিন্তু কবি, তোমার রঘুবংশ-মহাকাব্য সমাপ্ত করবার সঙ্কল্প বিস্মৃত হয়ো না।

কালিদাস। সেও তো সাম্রাজ্যের উত্থানপতন-কাহিনীর কাব্য।

পুষ্যভূতি। দুঃখ এই, শুনতে পাব না।

কালিদাস। তোমার জীবন তো এখনো শেষ হয়নি।

পুষ্যভূতি। কোথায় হবে, কীভাবে হবে কে জানে।

কালিদাস। এখানেই হবে, শেষ মুহূর্তে মহাকাল তাঁর সেবককে ডাক দিতে ভুলবেন না।

পুষ্যভূতি। তবে এবার উঠি, রাত্রি অনেক হল।

তখন চারজনে যথাযোগ্য নমস্কার অভিবাদনাদি করিলেন এবং নিজ নিজ নিকেতন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আকাশের অন্ধকারে নীলাভ রেখা টানিয়া একটি জ্যোতির্ময় নক্ষত্র স্বস্থান হইতে স্খলিত হইল।

পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে পুষ্যভূতি মহাকাল মন্দিরে প্রণিপাত করিয়া অশ্বারোহণে, যোদ্ধৃবেশে উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিলেন। তখনো সমস্ত নগর নিদ্রিত। সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া, রাজপথে উপস্থিত হইয়া পুষ্যভূতি একবার

নগরের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন তোরণশীর্ষে সিংহের স্ফীত কেশর সূর্যের প্রথম রশ্মিতে স্ফুটোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর দেখিলেন, সিংহদ্বারে সংলগ্ন সমুদ্রগুপ্তের প্রকাণ্ড রণ-দামামা। ঐ রণ-দামামা কালে গুপ্তসম্রাটগণের বিজয়-বাহিনীর পুরোভাগে গম্ গম্ গম্ভীর ভৈরব আরাবে শত্রুহৃদয়ে ভীতি জাগাইয়াছে, বিজয়মুহূর্তে আসমুদ্রহিমাচল গুপ্তবংশের গৌরব ঘোষণা করিয়াছে, আবার অজেয় বাহিনীর রাজধানী প্রত্যাবর্তনকালে বিপুল ধ্বনিতে নগরবাসীকে পূর্বাহ্ণে জয়োল্লাসে সচেতন করিয়া দিয়াছে, তাহারা প্রাকারে চড়িয়া আনন্দগর্জন করিয়াছে, 'জয় মহারাজের জয়'; রাজ-অশ্ব সেই ধ্বনি-সমারোহে উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বাহনগৌরবে নিজেকে ধন্য মানিয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া, নাসারন্ধ্র স্ফীত করিয়া, স্বেদচিক্কণ পেশীতে পেশীতে শক্তি ও লাবণ্য প্রতিফলিত করিয়া প্রথম জোয়ারের যৌবন-সমুদ্ধত তরঙ্গভঙ্গীতে পদচারণ করিয়াছে। পুষ্যভূতি দেখিলেন, সেই সহস্র স্মৃতির সেই রণদামামা আজ অনাদৃত, উপেক্ষিত, বিস্মৃত। আবাল্যসৈনিক পুষ্যভূতি অতিকষ্টে অশ্রু সংযত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কশা প্রয়োগ করিলেন। ঘোড়া তীরবেগে ছুটিল। সম্মুখে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ, পশ্চাতে দুর্জ্ঞেয় অতীত।

পুষ্যভূতির উজ্জয়িনী পরিত্যাগের পরে শ্বেতহূন তোড়মান ও গুপ্ত সম্রাট্গণের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে মৈত্রী

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে রাজধানীতে শ্বেতহূনগণের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্রুত বাড়িতে লাগিল। আবার, পুষ্যভূতির স্থলে মহামাত্য সুরপালের পুত্র নরপাল মহাদণ্ডনায়ক পদ লাভ করাতে শ্বেতহূনগণের বিশেষ সাহায্য হইল। নরপাল গোড়া হইতেই শ্বেতহূনগণের প্রতি অনুকূল ছিল, তাহার প্রভাবে মহামাত্য সুরপালও তাহাদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ, অসামরিক ও সামরিক উভয় বিভাগই শ্বেতহূনদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল। রাজপারিষদগণ চিরকালই 'জল কাতের দল'; কোন্‌দিকে এখন জল-স্রোতের তোড় দেখিয়া তাহারা বাহ্লীক দেশের ভাষায় পাঠ লইতে লাগিল, যদিচ তাহাতে ভাষা-শিক্ষা অগ্রসর হইল না; শ্বেতহূন ও রাজপারিষদগণ ভাষা-শিক্ষার অজুহাতে কাছাকাছি আসিয়া পড়িল; সন্ধ্যাবেলায় তাহারা শ্বেতহূনদের নিকেতনে উপস্থিত হইয়া বাহ্লীক দেশের আচারব্যবহার শিল্পকার্য শিক্ষাদীক্ষা যে কত উন্নত, পুরুষেরা যে কত বীর, তাহাদের রমণীরা যে কত সুন্দর, তাহাদের সুর যে কত মধুর হাতে কলমে তাহার পাঠ লইতে লাগিল।

উজ্জয়িনীর শ্বেতহূন সমাজের প্রধান বক্কনাস। প্রত্যক্ষতঃ সে একজন ব্যবসায়ী, অন্য শ্বেতহূন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ বুঝিবার উপায় নাই; সারাদিন সে বিপণিতে বসিয়া বাহ্লীক দেশীয় শিল্পদ্রব্য বেচাকেনা করে। লোকটি যেমন মিষ্টভাষী, সদালাপী, তেমনি দাতা। উপলক্ষ্য

যতই সামান্য হোক মুক্ত হস্তে সে দান করে। কেহ শুধায়, সব যদি দিয়েই ফেললেন আপনার থাকলো কি?

বক্কনাস বলে, আপনাদের আশীর্বাদ, তাছাড়া কি জানেন, এখানে যে ধন উপার্জন করছি তা এখানেই ব্যয় হওয়া আবশ্যক।

কেহ হিসাব করিবার কষ্ট স্বীকার করে না, করিলে দেখিতে পাইত যে পরিমাণ সে উপার্জন করে দান করে তাহার অনেক বেশি। কেহ হিসাব করিত না, তাই প্রশ্নও করিত না, উদ্বৃত্ত ধন আসে কোথা হইতে।

শ্বেতহূনদের সহিত ব্যবসায় দ্বন্দ্বে না পারিয়া উজ্জয়িনীর যেসব ব্যবসায়ী দেউলিয়া হইল, তাহারা মিষ্টভাষী বক্কনাসের কাছে অনুযোগ করিল—আমরা যে মরলাম।

বক্কনাস উদ্‌ব্যস্ত হইয়া বলিল, সে কি একটা কথা। আমাদের দেশে এমন অবস্থায় প'ড়ে যারা দেউলে হয় রাজ সরকার হতে তারা ভাতা পায়। দেউলে ব্যবসায়ীরা বলিত, আমাদের পোড়া দেশে সে নিয়ম নেই।

বক্কনাস বলিত, রাজসরকার না থাকে আমি তো আছি। অনুগ্রহ ক'রে আমার কাছে চাকুরি স্বীকার করুন।

অনন্যোপায় দেউলেরা শ্বেতহূনদের বিপণিতে চাকরি গ্রহণ করিল, দেখিল, ব্যবসায় করিয়া সারা মাসে যাহা উপার্জন করিত, এখানকার বেতন তাহার চেয়ে অনেক বেশি, উপরির মধ্যে শ্বেতহূনদের সদয় ব্যবহার। তাহারা

ভাবিতে শুরু করিল আমাদের মহারাজ নিতান্তই অকর্মণ্য, আহা যদি বাহ্লীকদেশের অধিবাসী হইতাম।

একদিন বক্কনাস প্রচুর ভেটসামগ্রী লইয়া কালিদাসের কবিনিকেতনে উপস্থিত হইল।

কালিদাস ভেটসামগ্রী প্রত্যাখ্যান করিয়া শুধাইলেন, কি অভিপ্রায়ে আগমন?

বক্কনাস বলিল, বাহ্লীক-উজ্জয়িনী মৈত্রী প্রসঙ্গে একখানি নাটক রচনা করুন।

কালিদাস বলিলেন, এখন অশক্ত হয়ে পড়েছি, কাব্য রচনার শক্তি আমার আর নেই।

পরদিনে বক্কনাস প্রচুরতর ভেটসামগ্রী লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইল।

বুধগুপ্ত কুশল সম্ভাষণ সারিয়া শুধাইলেন, কি সংবাদ?

মহারাজ, উজ্জয়িনী-বাহ্লীক মৈত্রী উপলক্ষ্যে একখানি নাটক অভিনয় করতে চাই, অনুমতি দান করুন।

বিস্মিত বুধগুপ্ত শুধাইলেন--নাটক? নাটক লিখ্‌ল কে?

তরুণ কবি পুণ্ডরীক।

অধিকতর বিস্মিত বুধগুপ্ত বলিলেন, লোকটা নাটকও লেখে নাকি? ওকে তো পথে পথে ঘোষণা করে বেড়াতে দেখি।

মহারাজ, লোকটি ঘোষণা করতে করতে এবারে মৈত্রী ঘোষণা করেছে, বড় উপাদেয় নাটক হয়েছে।

উজ্জয়িনীর শ্বেতহূনগণ অতি যত্নে অতি সত্বর উজ্জয়িনীর

ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, যদিচ শ্বেতহূনদের সহিত ঘনিষ্ঠ উজ্জয়িনীবাসিগণ বাহ্লীক ভাষায় 'কর' 'খল'-র চেয়ে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

মহারাজ শুধাইলেন, নাটকখানার নাম কি?

শ্বেতকহ্লার।

বাঃ বেশ নামটি তো।

বস্তুটি আরও সুন্দর।

তারপরে একদিন সন্ধ্যায় রাজ-অনুমতিক্রমে তরুণ পুণ্ডরীক রচিত শ্বেতকহ্লার অভিনীত হইল। তাহার বারো আনাই কালিদাসের নাটক ও কাব্য হইতে চুরি, বাকিটুকু অপাঙ্‌ক্তেয় ভাষায় ও ভুলছন্দে বাহ্লীক দেশের নির্লজ্জ স্তুতিবাদ।

সভাসদগণের অধিকাংশই ধন্য ধন্য করিল, যাহারা দেখিবার সুযোগ পায় নাই তাহারা আরো বেশি প্রশংসা করিল, বলিল, বুড়ো কবিটাকে আচ্ছা নাকাল করে ছেড়েছে। সাবাস ছোকরা।

অতঃপর বক্কনাস বুধগুপ্তের কাছে প্রস্তাব করিল যে মহারাজ পুণ্ডরীকের কবিখ্যাতি স্মরণ করিয়া তাহাকে রাজকবি নিযুক্ত করা কর্তব্য।

বুধগুপ্ত উত্তর করিলেন যে না তাহা হইবে না, যতদিন মহাকবি জীবিত আছেন তিনিই রাজকবি থাকিবেন।

কিন্তু পুণ্ডরীক একেবারে নিরাশ হইল না। বক্কনাসের

অনুরোধে পুণ্ডরীক যুবরাজ পুরগুপ্তের অনুগ্রহভাজন হইল। যুবরাজ শ্বেতহূন সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

পুণ্ডরীকের খ্যাতিতে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা আড়ালে বলাবলি করিতে লাগিল, উনি রাজকবি হ'তে পারলেন না, তবু মন্দ কি যুবরাজ কবি তো হ'লেন।

কিন্তু পুণ্ডরীক লোকটা নিতান্ত নির্বোধ নয়। সে জানিত অপরে যাহাই বলুক না কেন, কালিদাস তাহার কাব্য সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত প্রকাশ না করিলে ভারতীয় কবি সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে না। তাই সে একদা গুটি গুটি কবি-নিকেতনে আবির্ভূত হইল।

তখন অপরাহ্ন। মহাকবি নিজ উদ্যানে একাকী বসিয়া ফুলগাছগুলির তলা হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলিতেছিলেন। এমন সময়ে সেখানে পুণ্ডরীক উপস্থিত হইল।

পুণ্ডরীক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে কালিদাস শুধাইলেন, কি চাও বাপু?

পুণ্ডরীক বলিল, মহাকবির আশীর্বাদ।

কালিদাস বলিলেন, বাপু হে, তোমার যা বিদ্যা-বুদ্ধি তাতে তুমিই এখন আমাকে আশীর্বাদ করতে পারো।

সে কি! সে কি! ও কথা শুনলেও যে পাপ।

পাপপুণ্য বোধ কি তোমার আছে?

সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া পুণ্ডরীক বলিল, আমার লেখনী আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী।

বরঞ্চ আমিই তোমার লেখনীটির প্রার্থী।

এমন বলছেন কেন?

দেখছ না আগাছা ছিঁড়তে কষ্ট হচ্ছে, ওটি পেলে আমার কাজ সহজ হবে।

পুণ্ডরীক মনে মনে রাগিল, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল, আমার শ্বেতকহ্লার কাব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত প্রকাশ করুন।

নিজের কাব্য সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করবো বলো, ওর আগাগোড়াই তো কুমারসম্ভব থেকে চুরি। কুমারসম্ভব যে আমাকে এমন ক'রে মার দেবে তখন কে জানত!

পুণ্ডরীক রাগিয়া বিনা সম্ভাষণে কবিনিকেতন পরিত্যাগ করিল।

কালিদাস আবার আগাছা নিষ্কাসনে মনোনিবেশ করিলেন।

পুণ্ডরীক সোজা বক্রনাসের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, দেখুন একটা কথা মনে হ'ল।

বলুন, বলুন কি।

বক্রনাস সর্বদাই মিষ্টভাষী, সর্বদাই বশংবদ।

আমরা তো শ্বেতহূন সমাজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য প্রাণপাত করছি। কিন্তু ঐ কুমারসম্ভব কাব্যখানা তার পরিপন্থী।

কেন?

ওখানার মূলে আছে মহারাজ স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক শ্বেতহূন বাহিনী পরাজয়ের ঘটনা। শ্বেতহূন-উজ্জয়িনী মৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটা এখন প্রতিক্রিয়াশীল দাঁড়ায় নাকি?

অবশ্যই দাঁড়ায়। কিন্তু এখন কর্তব্য?

ঐ কাব্যখানা এখন যাতে ঘরে ঘরে পঠিত না হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

বক্কনাস হাসিয়া বলিল, আপনি শুধু ভাবী রাজকবি নন, প্রত্যক্ষ রাজনীতিজ্ঞও বটে। কিন্তু উপায় কি?

মহারাজকে অনুরোধ করলে হয় না?

সে সময় এখনো আসেনি।

তবে যুবরাজকে?

এ প্রস্তাব মন্দ নয়।

তখন অবসর মতো বক্কনাস একদিন কথাটার উপরে রঙ চড়াইয়া যুবরাজের কাছে বলিল। যুবরাজ আগের দিনেই বক্কনাসের কাছ হইতে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন পাইয়াছিলেন, কাজেই কথাটা সহজেই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, তাই তো কথাটা তো মিথ্যা নয়।

তখন যুবরাজের আদেশে তাঁহার অনুগ্রহভাজনদের গৃহে কুমারসম্ভব কাব্য পাঠ নিষিদ্ধ হইল। সকলে শ্বেতকহ্লার পড়িতে সুরু করিল।

নিচুলের কাছে ঘটনা শুনিয়া কালিদাস বলিলেন, শ্বেত-

কহ্লার পাঠে আমার কাব্যই তো পঠিত হচ্ছে অতএব চিন্তা কিসের ?

উল্লসিত পুণ্ডরীক স্তাবক সমাজে বলিল, এবারে কুমারের মুণ্ডপাত করেছি।

স্তাবকগণ বলিল, হবে না কেন, আপনি যে তারকাসুর।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশংসার মতো নিন্দা অল্পই আছে।

রমানী বিদূষী, রূপসী, যুবতী ; রমানী নৃত্যগীত-পটীয়সী, সকল কলায় কলাবতী, হাবভাব ছলাকলাময়ী ; রমানী রঙ্গব্যঙ্গনিপুণা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যবিভবা, হাস্যলাস্যচতুরা ; রমানী বিলাসিনী, ঐশ্বর্য্যময়ী ; পুরুষশাসনে সুদক্ষা। নগরের শৈবাল দীঘির তীরে মণিকুট্টিম নামে প্রাসাদে তাহার নিবাস। ঐশ্বর্য্যে ও প্রভাবে সে প্রাসাদের স্থান এখন মহারাজের ও যুবরাজের প্রাসাদের ঠিক পরেই। দিবসে নগরের প্রধান রাজপুরুষগণ, কবি সাহিত্যিক শিল্পীগণ নিয়মিত আসিয়া থাকেন ; রাত্রিতে সেখানে আসেন আরও বিশিষ্ট রাজ-পুরুষগণ, এবং স্বয়ং যুবরাজ। যুবরাজ পুরগুপ্ত রমানীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়দাতা।

পুষ্যভূতির বিদায়ের ও মৈত্রী প্রস্তাব গৃহীত হইবার কিছু দিন পরে একদিন একটি শ্বেতহূন দলের সহিত রমানী নগরে প্রবেশ করিয়াছিল। শ্বেতহূনগণের ঐশ্বর্য্যে ও বিলাসে নাগরিকগণ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল তবু নবাগত দলটির

ঐশ্বর্য্যের চমক তাহাদের কাছে অভিনব বোধ হইল। সকলে বলাবলি করিল—সে দেশ কুবেরের ভাণ্ডার।

বঙ্কনাস রমানীকে যুবরাজের সভায় লইয়া গেল। প্রচুর ধনরত্ন ও অপূর্ব সব শিল্পবস্তু যুবরাজের সম্মুখে অর্পণ করিয়া রমানী অভিবাদন করিল।

বঙ্কনাস বলিল, যুবরাজ ইনি বাহ্লীক দেশের সংস্কৃতি-লক্ষ্মী, ইনি আপনার আশ্রয়প্রার্থিনী।

যুবরাজ বলিলেন—এঁর হাবভাব ও মুখশ্রীই এঁর প্রধান অভিজ্ঞান, অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

তারপরে যুবরাজের নির্দেশে মণিকুট্টিম নামে যুবরাজের নিজস্ব প্রাসাদে রমানী স্থান লাভ করিল।

নাগরিকগণ আবার বলাবলি করিল—এরা থাকে কোথায়? ঠিক সময়ে আসে, ঠিক বস্তুটি করায়ত্ত করে। ঝোপ বুঝে কোপ মারায় এদের জুড়ি নেই।

কিন্তু নাগরিকগণের সন্দেহে বা উদাসীনতায় ঘটনা-স্রোতের কিছু তারতম্য ঘটিল না। অবিরাম বেগে অনিবার্য পরিণামের দিকে তাহা ছুটিয়া চলিল।

শিপ্রা নদীর তীরে নব প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের অদূরে দেবদাসী নিকেতন।

দক্ষিণ প্রদেশ হইতে আগত দেবদাসীগণের সেটি আশ্রয়-

সৌধ। শতাধিক সুন্দরী যুবতী নানা কলাবিদ্যায় শিক্ষিতা দেবদাসীর যিনি অধিনেত্রী তাঁহার নাম মধুবল্লরী। মধুবল্লরী রূপে, বিদ্যায় ও নানা গুণে সত্যই অধিনেত্রী হইবার যোগ্য। মহামাত্য সুরপাল তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। মহামাত্যের অনুগত রাজপুরুষ ও সামন্তগণ অমিত হস্তে কৃপা ও অর্থ বর্ষণ করিয়া মধুবল্লরীর প্রভাব ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে। দেবদাসী-নিকেতন দিবারাত্রি অনুগত ও পৃষ্ঠপোষকগণের প্রশংসায় ও উল্লাস-ধ্বনিতে মুখর।

উজ্জয়িনীর নাগরিক জীবনের উপর বিদুষী নারীর প্রভাব সমধিক। এক সময়ে এইরূপ নারী নগরীতে একজন মাত্র ছিলেন, আর্যা শীলবতী। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কালিদাস, নিচুল ও পুষ্যভূতির মতো দু'চারজন বৃদ্ধ ব্যতীত তাঁহার সঙ্গ এখন আর কেহ কামনা করে না।

তারপরে আসিল মধুবল্লরী। তাহার রূপ যৌবন ও কলাবিদ্যায় দেবতার স্বাক্ষর থাকাতে নাগরিক জীবনে অনায়াসে সে একটি মহনীয় স্থান অধিকার করিয়া লইল।

শীলবতী বৃদ্ধা, কাজেই মধুবল্লরীর অচিরে আধিপত্য হইল এবং যেহেতু সে নিঃসপত্ন, সেই আধিপত্য একাধিপত্যে পরিণত হইতে সময় লাগিল না। উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষী রাজপুরুষ জানিত তাহার ইচ্ছার উপরে মধুবল্লরীর প্রসন্ন দৃষ্টির, মুদ্রাঙ্ক না পড়িলে তাহার রুদ্ধ পথ মুক্ত হইবার আশা নাই। অর্থাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জানিত যে মধুবল্লরীর একটি হাসি সহস্র

স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও দুর্লভ। সকলেই জানিত যে তাহার অধরোষ্ঠে নগরীর সত্যকার স্বর্ণমুদ্রার নির্মিতিশালা। কেন, না হইবে, স্বয়ং মহামাত্য তাঁহার পৃষ্ঠপোষক।

এমন সময়ে রমানীর আবির্ভাব ও যুবরাজের অনুগ্রহ লাভ। মধুবল্লরীর আসন নড়িল। সামান্য একটি ভূখণ্ডের ব্যবধানে দণ্ডায়মান দুটি প্রাসাদ পরস্পরের দিকে উত্থিত তর্জনীর মতো অটল হইয়া রহিল আর তাহাদের শিখরে অদৃশ্যভাবে বসিয়া দুই প্রাসাদেশ্বরী পরস্পরের রন্ধ্রানুসন্ধানের অবকাশে পরস্পরের নিপাত কামনা করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যায় মণিকুট্টিম প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষে যুবরাজ পুরগুপ্ত রমানীর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, পাশেই বক্রনাস বসিয়াছিল।

যুবরাজ বলিলেন, রমানী তোমাদের দেশের সবই সুন্দর।

রমানী বলিল, যুবরাজ খুব সম্ভব সেটা আপনার চোখের গুণ।

শুধু চোখের গুণ নয় সুন্দরী।

কি রকম ?

আমরাও তো কথা বলি কিন্তু কানে তো এমন মধুর লাগে না, অথচ তোমার মুখে কথাগুলো কেমন মধুস্রাবী।

তবে সেটা আপনার কানের গুণ।

সকলে হাসিয়া উঠিল। যুবরাজ দেখিলেন সে দেশের

হাসিও সুন্দর, রমানীর হাসিতে দক্ষিণা হাওয়ায় এক গুচ্ছ জুঁই ফুল যেন ঝরিয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য যুবরাজ বাহ্লীকের ভাষা জানিতেন না। রমানীই উজ্জয়িনীর ভাষা শিখিয়া লইয়াছিল। শিশুর আধো আধো ভাষার মতো রমানীর মুখে উজ্জয়িনীর ভাষা বড় মধুর শোনাইতেছিল।

যুবরাজ শুধাইলেন, তুমি আমাদের দেশের ভাষা শিখলে কোথায় ?

কেন, আমাদের দেশে।

বলো কি সেখানে কি আমাদের ভাষা পরিজ্ঞাত ?

বিলক্ষণ! আমাদের দেশে আপনাদের ভাষা আমাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা।

কি আশ্চর্য!

কিছুই আশ্চর্য নয়, আমরা গুণের আদর জানি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এমন কি মহাকবি কালিদাসের কাব্যও আমরা অনেকদিন অনুবাদ ক'রে ফেলেছি।

বিস্মিত যুবরাজের মুখে কথা জোগাইল না, কেবল বলিলেন, সত্যই তোমরা গুণের আদর জানো।

গুণের আদর জানি বলেই তো আমরা এত দূরে এসেছি।

তাইতো দেখছি। কিন্তু দুঃখ এই যে এমন আশ্চর্য দেশ চোখে দেখবার সুযোগ হ'ল না।

না হ'বার কারণ তো দেখছি না, একবার সেখানে শুভ

পদার্পণ করুন না কেন, সমস্ত বাহ্লীক উজ্জয়িনীর যুবরাজকে দুই বাহু মেলে আলিঙ্গন করে নেবে।

তাহা যে লইবে যুবরাজ তাহার কিছু পরিচয় ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন।

তিনি বলিলেন, না মহারাজ আমাকে অত দূরদেশে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না।

সে কথা ঠিক। তবে এক কাজ করুন না কেন, উজ্জয়িনীর নাগরিকদের একদল প্রতিনিধিকে আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিন না কেন। তারা দেখে আসুক। নিজে দেখে আসাই সর্বোত্তম। তা নিতান্ত সম্ভব না হ'লে নিজের দেশের লোকের দেখাও মন্দ নয়।

একথা মন্দ বলো নি! কি বলো বক্রনাস?

বক্রনাস এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ছিল। এবারে বলিল, আমি অনেকদিন কথাটা ভেবেছি কিন্তু সাহস করে বলতে পারি নি।

তাই পাঠিয়ে দিন মহারাজ।

রমানী আমি যুবরাজমাত্র।

আমাদের চোখে আপনিই মহারাজ।

স্তুতি যত মিথ্যাই হোক না কেন তাহা সর্বদাই মধুর শোনায়।

কারা যাবে?

এবারে বক্রনাস বলিল, সে বিষয় ভেবে আপনি মিছে

উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনার অনুমতি যখন হ'য়েছে আমি এবারে সব ঠিক ক'রে নেবো।

বেশ তবে তাই করো।

কয়েকদিনের মধ্যেই মহারাজের অনুমতিক্রমে, যুবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় একদল নাগরিক কয়েকজন শ্বেতহূনের পথ-প্রদর্শকতায় বাহ্লীক যাত্রা করিল। বক্রনাস নিজের অনুগত এবং মৈত্রীরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একদল নাগরিককে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। বক্রনাসের প্রস্তাব শুনিয়া তাহারা নাচিয়া উঠিল! কেহ বলিল, এমন সৌভাগ্য যে হবে ভাবি নি। কেহ বলিল, সবই বক্রনাসের অনুগ্রহ। কেহ বলিল—তীর্থদর্শনে চল্‌লাম। সবাই বলিল—পাঠশালা ছাড়বার পরে শিক্ষার এমন সুযোগ এই প্রথম।

তারপর একদিন সুপ্রভাতে নাগরিকগণের দলটি অশ্বারোহণে উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিল। মৈত্রীরসে অভি-ষিক্তগণের মধ্যে যাহারা যাইবার সুযোগ পাইল না তাহারা নিজেদের হতভাগ্য মনে করিতে লাগিল, ভাবিল মৈত্রীরসে আরও একটু ডুবিতে হইবে। যাহারা শ্বেতহূনদের আগমন ও প্রভাব প্রতিপত্তি সন্দেহের চোখে দেখিত তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল, লক্ষ্মীছাড়াগুলো না ফিরে এলেই বাঁচি।

নিচুল কালিদাসের কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিল, এবারে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের সূত্রপাত।

কালিদাস বলিলেন, অতঃপর আসন্ন লঙ্কাকাণ্ড।

উজ্জয়িনী হইতে বাহ্লীক বহুশত যোজন পথ। দুর্গম গিরিমালা, দুঃসহ মরুভূমি, দুস্তর নদনদী অতিক্রম করিয়া তবে বাহ্লীক পৌঁছিতে হয়। শ্বেতহূন নেতৃত্বে পরিচালিত দলটি অনেকদিন পথ চলিয়া অবশেষে ভারত সীমান্তে সিন্ধুনদতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সিন্ধু পার হইবার সময়ে সকলে লক্ষ্য করিল একটি গিরিশৃঙ্গের উপরে দণ্ডায়মান এক যোগীপুরুষ অস্তমান সূর্য্যের বন্দনা করিতেছে। নাগরিকগণ উদ্দেশ্যে তাহাকে প্রণাম করিল।

একজন শ্বেতহূন শুধাইল—কাকে তোমরা প্রণাম করলে ?

ঐ যোগীবর কে।

আঃ ছি ছি, আমাদের দেশে এরূপ কখনো করে না।

কেন ?

যোগী, সন্ন্যাসী, সাধু প্রভৃতি সমাজের শত্রু।

ওঁরা সমাজের কি ক্ষতি করেছেন ?

প্রত্যক্ষত করে নি। কিন্তু ধর্ম ধ্যানধারণা পূজা অর্চনা প্রভৃতি সামাজিক অনাচার। ও সবের ফলে মানুষের মন সমাজ-কল্যাণকে উপেক্ষা করে, আর কেবলি 'মুক্তি' 'মুক্তি' ক'রে সকলের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এসব কথা উজ্জয়িনীবাসীদের কাছে নূতন। তাহাদের ইচ্ছা হইল প্রতিবাদ করে, কিন্তু তেমন মজবুত যুক্তি খুঁজিয়া পাইল না, তাহা ছাড়া শ্বেতহূনগণের অপ্রীতিকেও

তাহারা ভয় করিত। তাই তাহাদের কেহ কেহ বিপরীত প্রশ্ন করিল—সমাজের কল্যাণ কিসে হয়?

কেন, নাচগান আমোদ উৎসব। অপর শ্বেতহূন বলিল—এ সবের সমষ্টিগত নাম সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতিচর্চার ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, মানসিক উল্লাস বাড়ে, জ্ঞানে ও উল্লাসে সমাজের উন্নতি হয়, সামাজিক কল্যাণ আর কাকে বলে।

নাগরিকগণ এইরূপ সমাধানে সন্তুষ্ট না হইলেও প্রতিবাদ করিল না, ভাবিল ইহার মধ্যে গূঢ়ার্থ আছে, তাহারাই বুঝিতে পারিতেছে না, কালক্রমে বুঝিতে পারিবে ভাবিয়া তাহারা একপ্রকার সান্ত্বনা লাভ করিল।

আরও অনেকদিন পরে দুর্গম হিন্দুকুশ গিরিমালা অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাহারা একদিন অক্ষুনদীতীরবর্তী বাহ্লীক রাজ্যের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিল।

নগরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া নাগরিকগণ দেখিল নগরী সুসজ্জিত, গৃহে গৃহে পতাকা ও পুষ্পমালা, পথে উৎসববেশী নরনারী, চত্বরে চত্বরে তূরী ভেরী ধ্বনিত।

উজ্জয়িনীর নাগরিকগণ শুধাইল, আজ কোন উৎসব আছে কি?

একজন শ্বেতহূন বলিল, উৎসব বই কি। তোমাদের পদার্পণই উৎসবের কারণ।

নাগরিকগণ আনন্দিত হইল।

তাহারা নগর চত্বরে পৌঁছিবামাত্র স্বয়ং শ্বেতহূনরাজ

তোড়মান সপারিষদ আসিয়া নাগরিকগণকে অভ্যর্থনা জানাইল, বলিল, নগরীশ্রেষ্ঠ উজ্জয়িনীর নাগরিকশ্রেষ্ঠগণের শুভ পদার্পণে বাহ্লীক রাজ্য আজ ধন্য, বাহ্লীক উজ্জয়িনীর মৈত্রী উভয় নগরীর প্রীতি-শৃঙ্খলে আজ চিরতরে আবদ্ধ।

নাগরিকগণের আনন্দের সঙ্গে বিস্ময় যুক্ত হইল। আর তাহাদের বিস্ময় ও আনন্দের যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান। তাহারা সকলেই বিদ্যাবুদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় অতি সাধারণ। উজ্জয়িনীতে তাহাদের কোন মানমর্য্যাদা ছিল না, রাজদর্শন কখনো ঘটে নাই, প্রধান অমাত্যগণ কখনো তাহাদের ডাকিয়া দুটা কথা বলে নাই। এমন অবস্থায় আজ যখন স্বয়ং রাজা আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিল তাহাদের গুণপনা বর্ণনা করিল, তাহারা ভাবিল, তবে তাহারা সামান্য লোক নয়, নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে নিগূঢ় অসাধারণত্ব আছে, নতুবা বাহ্লীকরাজ কেন এমন করিয়া বলিবে? তাহার তো স্তুতিবাদ করিবার কোন আবশ্যক নাই। এই মূল চিন্তাসূত্র হইতে নানারূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের মনে উদিত হইল। তাহারা ভাবিল যে উজ্জয়িনীর সামাজিক ব্যবস্থাটাই ভ্রমাত্মক; ভাবিল, বাহ্লীকরাজ্যের সামাজিক ব্যবস্থাটাই আদর্শ; ভাবিল আহা কবে উজ্জয়িনীতে তথা সমগ্র আর্য্যাবর্তে এ হেন সামাজিক অবস্থার প্রবর্তন হইবে।

পরদিন পুরশ্রী মণ্ডপে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকগণের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হইল। সেই সভায় তোড়মান ও প্রধান

পাত্রমিত্রগণ যে ভাষায় উজ্জয়িনীবাসীগণের স্বাগত জানাইল তাহা কোন রাজাধিরাজের সম্বন্ধেও কোন চাটুকার রাজকবি কর্তৃক কখনো প্রযুক্ত হয় নাই। তারপরে যখন শ্বেতকহ্লার রচয়িতা কবি পুণ্ডরীককে নিখিল আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠতম কবি বলিয়া বর্ণনা করা হইল, বলা হইল যে ব্যাস বাল্মীকির কাব্য তাঁহার প্রতিভার দীপ্তিতে ম্লান যখন কালিদাসের নামটি পর্যন্ত উচ্চারিত হইল না, তখন নাগরিকগণের বিস্ময় ও আনন্দ চরমে পৌঁছিল। তাহারা ভাবিল—তাই বলো, মনুষ্যত্ব ও প্রতিভা বিচারের পৃথক্ মাপকাঠিও পৃথিবীতে বিদ্যমান; তাহারা বুঝিল যে সত্যই তাহারা মনুষ্যত্বে, প্রতিভায় ও অন্য গুণরাজিতে অমিত-সাধারণ। তখন তাহাদের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে আসিল সামাজিক-প্রতিষ্ঠা-লোভ; এতদিন যাহাদের গুণী বলিয়া জানিত এখন তাহাদের নির্গুণ বলিয়া মনে হইল; মনে হইল, তাহারা কেবল চাটুবাদের বলেই উচ্চে অবস্থিত। নাগরিকগণ সঙ্কল্প করিল এবারে দেশে ফিরিয়াই ঐ সব শূন্যগর্ভ উচ্চপদস্থ-গণকে টানিয়া নামাইতে হইবে এবং সেই সব শূন্য আসনে নিজেরা চড়িয়া বসিবে। কিন্তু তাহার উপায় কি? বিশ্বাস-ঘাতকতা, কৃতঘ্নতা ও ষড়যন্ত্র। কয়েকদিন বাহ্লীকে অবস্থান করিয়া তাহারা বুঝিল ঐগুলি দোষাবহ নয়, বরঞ্চ আদর্শ-সিদ্ধির ক্ষেত্রে ঐগুলি সহায়। তবে যে দোষাবহ মনে হয় তাহার কারণ সামাজিক কুশিক্ষা, উচ্চে অবস্থিতগণ নিজেদের

প্রভাব প্রতিপত্তি অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে ঐ সব উপায়কে দোষাবহ বলিয়া প্রচার করিয়াছে। তাহাদের সহায় নীতি-বাগীশগণ ও কালিদাসের মতো সমাজউদাসীন কবিগণ—আর ইহাদের সকলের পৃষ্ঠপোষক রাজশক্তি।

বলা বাহুল্য এই সিদ্ধান্তে একদিনে তাহারা পৌঁছায় নাই। তাহাদের সংবর্ধনা, আদর-আপ্যায়ন, বাহ্লীকরাজ্যের দার্শনিক ও অমাত্যগণের আলাপ আলোচনা ধীরে ধীরে অনিবার্য বেগে তাহাদের ঐ সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলিতেছিল। তারপরে যখন বাহ্লীকরাজের প্রীতির সামান্য নিদর্শন বলিয়া প্রত্যেক নাগরিককে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, মণিরত্ন ও বিবিধ মূল্যবান উপঢৌকন প্রদত্ত হইল তখন তাহাদের মন হইতে পূর্বতন সংস্কারের শেষ কণ্টকটি উৎপাটিত হইয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের মহীরুহ মহান্ গৌরবে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইল। আদর্শের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে সুবর্ণ যুক্ত হইলে আদর্শ অজেয় হইয়া ওঠে, অনন্যসহায় আদর্শের মতো অসহায় বস্তু সংসারে অল্পই আছে।

মণিকুট্টিম মণ্ডিত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠসমূহে নাগরিকগণের বাসস্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে; সুপেয় সুরা, সুরস ভোজ্য, রাজভোজ্য শয্যা, অন্যান্য কিঙ্কর কিঙ্করী তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর নির্দিষ্ট হইয়াছে প্রত্যেকের জন্য একজন করিয়া সুবেশা রূপসী নৃত্যগীত-ছলাকলাময়ী তরুণী।

বাহ্লীকরাজের প্রধান অমাত্য আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন,

আপনাদের সেবা ও সর্বপ্রকারে সাহায্য করবার জন্ত এইসব তরুণীদের নিযুক্ত করা হ'ল—অষ্টপ্রহর এরা আপনাদের সান্নিধ্যে থাকবে।

একদিন উজ্জয়িনীর নাগরিকগণকে বাহ্লীক রাজ্যের কবি, শিল্পী ও মনীষীগণের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। বাহ্লীকরাজ্যের পক্ষ হইতে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ কবি পুণ্ডরীককে একখানি মানপত্র প্রদত্ত হইল, তাহাতে এমন ভাষার প্রয়োগ হইয়াছিল যে স্বয়ং ব্যাস বাল্মীকিও ঈর্ষা অনুভব করিতে পারিতেন। তারপরে পরস্পরের পরিচয়ের পালা। উজ্জয়িনীর নাগরিকগণ বাহ্লীকের ভাষা জানে না, বাহ্লীকবাসীগণ উজ্জয়িনীর ভাষা জানে না—আলাপ-আলোচনা দোভাষীর মধ্যস্থতায় হইল। একজনকে বাহ্লীকরাজ্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল, সে ব্যক্তি কি লিখিয়াছে, আদৌ কিছু লিখিয়াছে কি না, এসব বিচার না করিয়াই উজ্জয়িনীবাসীগণ তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। বিজাতীয় অক্ষরে পূর্ণ দুইতাড়া তুলট কাগজ রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ বলিয়া দেখানো হইল। আনন্দে ও গৌরবে উজ্জয়িনীর নাগরিকগণ তাহা মাথায় ঠেকাইল, ভাবিল বাহ্লীক রাজ্যই বিদ্যার চরম আশ্রয়; বলাবলি করিল, দেখো না কেন অনুবাদের পাণ্ডু-লিপি স্বর্ণ-পেটিকায় রক্ষিত হইয়াছে, কই আমাদের দেশে তো এমন হয় না।

তারপরে শ্বেতহূনদের নেতৃত্বে নগরের যে অঞ্চলেই নীত হইল সেই অঞ্চলকেই তাহারা সুখৈশ্বর্যের লীলাস্থল দেখিল ; দেখিল সকলের গৃহ সমান ঐশ্বর্যে পূর্ণ, সমান সুন্দর, কোথাও দুঃখ দারিদ্র্যের চিহ্নমাত্র নাই।

নাগরিকদের একজন বলিল, দেখো ভাই এদের সকলের মুখে হাসিটি লেগেই আছে। অপর জন বলিল, হবে না কেন, এরা তো উজ্জয়িনীর নাগরিক নয় যে রাজকর ও রাজভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকবে। আর একজন বলিল—দেখো না, নগরে কোথাও একটিও ভিক্ষুক নেই। হবে না কেন ? এ তো উজ্জয়িনী নয়।

তৃতীয় একজন বলিল—কারো ঘরে তো অভাবের চিহ্ন দেখলাম না।

তখন সকলেই মনে মনে স্থির করিল—এবার ফিরিয়া উজ্জয়িনীকে এই ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহারা ভাবিল দুঃখ এই যে তাহারা বাহ্লীকবাসী না হইয়া দগ্ধ উজ্জয়িনীতে জন্মিয়াছে।

তারপরে বিদায়ের দিন আসিল। স্বয়ং তোড়মান অমাত্যগণ ও পুরবাসীরা সাশ্রুনেত্রে উজ্জয়িনীবাসীদের বিদায় দিল। এমন সুখের স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে ভাবিয়া দু'চারজন ঔজ্জয়িনীক তো কাঁদিয়াই ফেলিল। এ দেশের সুখ, ঐশ্বর্য, আদর-আপ্যায়ন, সেবা ও সেবার স্মৃতি ভুলিবার নয় ভাবিতে ভাবিতে উজ্জয়িনী প্রবাসী শ্বেতহূনগণের নেতৃত্বে

তাহারা স্বদেশাভিমুখে অশ্বারোহণে যাত্রা করিল। এবার অতিরিক্তের মধ্যে মূল্যবান ও দুর্লভ উপঢৌকন ভারে পীড়িত শতাধিক উষ্ট্র তাহাদের সঙ্গে চলিল। কিছুকাল আগেও উজ্জয়িনী পরিত্যাগের সময়ে যাহারা ছিল বিশ্বস্ত নাগরিক, আজ তাহারাই মনে মনে ঈর্ষার ছুরি শানাইতে শানাইতে সম্ভাবিত বিশ্বাসঘাতকরূপে বাহ্লীক রাজধানীর সিংহদ্বার লঙ্ঘন করিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই তাহারা সিন্ধুনদের তীরে আসিয়া পৌঁছিল, এবারেও সেই গিরিশিখরে দণ্ডায়মান যোগীকে তাহারা দেখিতে পাইল, কিন্তু আগের বারের মতো আর তাহার উদ্দেশে প্রণাম করিল না। ইতিমধ্যেই তাহাদের মনে বাহ্লীকের শিক্ষা ফলপ্রদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মানব-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করিলে ভগবানের অসীম কার্য-কারিতায় বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় না, যিনি এমন বস্তু গড়িতে পারেন তিনি সর্বশক্তিমান নিঃসন্দেহ!

পুষ্যভূতি জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঝরণার কাছে নামিতে ঝরণার নিকটে উপবিষ্ট এক দীনবেশ রমণীকে দেখিতে পাইলেন। রমণী তাহার পায়ের কাছে পত্রপুটে কিছু গোধুম-চূর্ণ ও মধু রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

পুষ্যভূতি শুধাইলেন, মা তুমি কে, কি জন্য এখানে?

রমণী বলিল, প্রভু, আমি দুঃখিনী, আর কি পরিচয় দেবো?

আমাকে তোমার কি প্রয়োজন ?

দেবতাকে মানুষের যে প্রয়োজন। মানুষী শক্তিতে অসম্ভব হ'লে তখনি দেবতার শরণ নিতে হয়।

আমি সামান্য মানুষ, দেবতা নই।

আপনি যোগী পুরুষ, ঐ তো দেবত্বের প্রথম সোপান।

বেশ, তোমার কি প্রয়োজন বলো, সাধ্য হ'লে করবো, কিন্তু মনে রেখো আমার শক্তি মানুষী, দৈবী নয়।

তখন সাহস পাইয়া রমণী আরম্ভ করিল, সে বলিল, প্রভু আমি দুঃখিনী বিধবা। সংসারে একটি শিশুপুত্র মাত্র আমার সম্বল। আমার অন্য সম্বলের মধ্যে একখানি ক্ষেত আছে। তাতে কিছু গোধূম উৎপন্ন হয়, তাতেই আমাদের সংবৎসর ভরণপোষণ চলে। এ বৎসর বন্য বরাহের উপদ্রব হ'য়েছে, সারা রাত্রি তারা ক্ষেতে যথেষ্ট উপদ্রব করে, শস্য নষ্ট হ'বার উপক্রম। আর কয়েকদিন এরকম চল্‌লে আগামী বৎসর আমরা দুটি প্রাণীতে অনাহারে মারা পড়বো।

পুষ্যভূতি বলিলেন—বন্য বরাহ তাড়াও না কেন ?

আমি অসহায় নারী, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

গ্রামস্থ লোকের সাহায্য প্রার্থনা করো।

কে সাহায্য করবে ? সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত নিয়ে ব্যস্ত। তাদের ক্ষেত থেকে তাড়া খেয়ে বরাহ দল আমার ক্ষেতে এসে প্রবেশ করে।

আমি কি করতে পারি ?

যোগী পুরুষের দ্বারা সমস্তই সম্ভব। আপনি মন্ত্র প্রয়োগে আমার ক্ষেত নিরুপদ্রব ক'রে দিন।

পুষ্যভূতি সস্নেহে বলিলেন—মাতঃ, মন্ত্র প্রয়োগে এ কার্য্য সম্ভব হ'লে অবশ্যই করতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আর তেমন কোন মন্ত্র থাকলেও আমার অজ্ঞাত।

তাহার কথা শুনিয়া নারী নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া বীরের হৃদয় বিচলিত হইল।

তখন পুষ্যভূতি বলিলেন, তোমার কোন্ গ্রাম?

ঐ যে ক্ষুদ্র গিরিচূড়া দেখা যাচ্ছে, ওরই ঠিক উত্তরে আমার গ্রাম।

ঐ গ্রামের কোথায় তোমার ক্ষেত?

গিরির ঠিক পাশেই, গ্রামে প্রবেশের মুখেই প্রথম ক্ষেত-খানি আমার।

পুষ্যভূতি বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন যাও। দেখি আমার দ্বারা কতদূর কি সম্ভব।

আশ্বাসবাক্যে প্রফুল্ল হইয়া রমণী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

শেষ রাত্রে পুষ্যভূতি গিরিশঙ্কুতে উঠিবার পথে ঝরণার ধারে বসিলেন, ঝরণার জলে তরবারির রক্ত ধৌত করিলেন, তারপর গিরিচূড়ায় উঠিয়া গুহায় প্রবেশ করিলেন! তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু ঘুম আসিল না, তাহার বদলে রাত্রির

অভাবিত অভিজ্ঞতা একটি বিচিত্র স্বপ্নের মতো তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

রমণীকে বিদায় দিবার সময়ে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে বাহুবলে বন্য বরাহ নিহত করিবেন। তিনি জানিতেন এই পরিণত বয়সেও সে কাজ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। রাত্রি গভীর হইলে তরবারি লইয়া তিনি গিরিচূড়া হইতে নামিয়া রমণী-প্রদত্ত নির্দেশ স্মরণ করিয়া তাহার গোধূম ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সত্যই তিনটি অতিকায় বরাহ গোধূম নষ্ট করিতেছে। একটিকে তিনি নিহত করিলেন, দ্বিতীয়টি আহত হইল, তৃতীয়টি আর দুটির অবস্থা দেখিয়া পলায়ন করিল। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন, বুঝিলেন অন্ততঃ এ বৎসরের জন্য রমণীর ক্ষেত্র নিরুপদ্রব হইল। শক-হূনবিজয়ী গুপ্ত সাম্রাজ্যের মহাদণ্ডনায়কের পক্ষে এ কাজ ছেলেখেলা মাত্র, কাজেই গৌরব অনুভব তিনি করিবেন কেন? কিন্তু না বলিলে অন্যায় হইবে যে তিনি আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, এমন আনন্দ অনেককাল তিনি অনুভব করেন নাই।

তিনি ভাবিতেছিলেন যে তরবারির উদ্দেশ্য আর্তত্রাণ। উজ্জয়িনী পরিত্যাগের সময়ে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে এ জীবনের মতো অসিব্রত তাঁহার সমাপ্ত হইল, এখন দেখিলেন, না, তাঁহার কাজ সমাপ্ত হয় নাই, অভাবিতভাবে তাঁহার উপরে দাবী হইল। পুষ্যভূতির মনে হইল আর

কিছুই নয়, ঐ রমণীর বরাহ নিধনে সাহায্য প্রার্থনা অদৃষ্টের একটি ইঙ্গিত মাত্র ; অদৃষ্ট দেখাইয়া দিল যে জীবন থাকিতে বীরের অসিব্রত কখনো শেষ হয় না। বিনিদ্রভাবে এপাশ ওপাশ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, অদৃষ্টের এই পরিণাম না জানি কি আকারে আসিবে। হয় তো এখনো তাঁহার অসির প্রয়োজন মানুষের আছে। তাঁহার মনে হইল বৃথা তিনি সন্ন্যাসের খাপে তরবারি ভরিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই ব্যর্থতা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই অদৃষ্টরূপে ঐ রমণী আসিয়া তরবারি কোষমুক্ত করিয়া দিল! বীরত্ব ও সন্ন্যাস দুটি পথের মূল্যই সমান, তবে সকলের এক পথ নয়, তাঁহার পথ কোন্‌টি ? সন্ন্যাস ? তবে হঠাৎ আর্তের আহ্বান আসিল কেন ?

পরদিন সেই রমণী আসিল, পুষ্পার্ঘ্য ও মধু-গোধূম নিবেদন করিয়া পুষ্যভূতিকে প্রণাম করিল, বলিল যে, মহাপুরুষের মন্ত্রবলে বরাহ নিহত হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্র এখন নিরাপদ।

পুষ্যভূতি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

বাহ্লীকপ্রত্যাগত নাগরিকগণ উজ্জয়িনীর সিংহদ্বারে পৌঁছিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। তাহারা দেখিতে পাইল সেখানে একটি বিপুল জনতা জমিয়াছে, তাহাদের কাহারো হাতে ফুলের মালা, কাহারো হাতে ফুলের ডালা, কাহারো হাতে পতাকা, অনেকে তূরী, ভেরী, জয়ঢাক, জগঝম্প

রাজাইতেছে। অল্প বুদ্ধি খরচ করিয়াই তাহারা বুঝিল ঐ সব আয়োজন তাহাদের অভ্যর্থনার জন্যই। তাহারা ভাবিল, তাই বলো, বিদেশে না গেলে মানুষের মূল্য নিরূপণ হয় না, যেমন হট্টস্থলে নীত না হইলে দ্রব্যের মূল্য অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। তাহারা রীতিমতো গৌরব অনুভব করিতে লাগিল—আর সেই সঙ্গে শ্বেতহূনগণের প্রতি এক প্রকার কৃতজ্ঞতার ভাবও অনুভব করিল, বাস্তবিক শ্বেতহূনগণ কর্তৃক বাহ্লীকে নিমন্ত্রিত না হইলে তাহাদের মূল্য তো অজ্ঞাত রহিয়াই যাইত। নাগরিক প্রতিনিধিগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময়ে স্বয়ং রমানী মধুর হাসির স্বুবর্ণ মুদ্রা বিতরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, হাতে তাহার একটি উদ্যত পুষ্পমাল্য। ঐ মালাটির দিকে প্রতিনিধি-গণ সকলে একযোগে গলা বাড়াইয়া দিল। রমানী বিপদে পড়িল, সে ভাবিয়াছিল নাগরিকগণের নায়ককে মাল্যে ভূষিত করিবে, এখন কি কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইল না, একজন নাগরিক মালাটি লইয়া রমানীর কণ্ঠে অর্পণ করিল, সকলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

তারপর রমানীর ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি প্রতিনিধিগণের গুণবর্ণনামূলক একখানি মানপত্র পাঠ করিল। মানপত্রে বর্ণিত অতিশয়োক্তির প্রত্যেকটি বর্ণ প্রতিনিধিগণের বিশুদ্ধ সত্য বলিয়া মনে হইল। তবে প্রত্যেকেই ভাবিল ওগুলি

কেবল তাহার সম্পর্কেই সাকুল্যে প্রযোজ্য, অপর সম্বন্ধে আংশিক মাত্র। যখন এই সব আনন্দ ও বিস্ময়ের গুঞ্জন চলিতেছে। এমন সময়ে জনতার মধ্য হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল—এরা কোন্ যুদ্ধ জয় ক'রে এলো ?

সকলে তাকাইয়া দেখিল বক্তা রাজসভার বিদূষক বসন্তক।

একজন বলিল, বসন্তক।

অপর একজন বলিল, না মাধব্য।

বিদূষক বলিল—কেন বাপু, আমার পৈতৃক নামটা মন্দ কি ?

মন্দ নয়, তবে এটা আরও ভালো।

আরো ভালোটা কি এমন ক'রে অপাত্রে অপব্যয় করতে হয়! নিজের জন্য তুলে রাখো।

জনতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একজন বলিল—আর কেউ হ'লে হাড় গুঁড়িয়ে দিতাম না।

অপর একজন বলিল—ওর মুখে সবই মানায়।

বসন্তক বলিল—সেই ভরসাতেই তো বলি বাপ সকল। তা আমার প্রশ্নের উত্তর তো পেলাম না—এঁরা কোন্ কীর্তি সাধন করেছেন ?

কিছুই জানো না দেখছি, কেবল আতপান্ন ও ঘৃত, দধি দুগ্ধের সর্বনাশ করতে জানো।

তাই বা প্রয়োজন মত পাই কোথায় ?

পাও না তো? স্বীকার করলে? এঁদের মতো বাহ্লীকে যাও, যথেষ্ট ভোজ্য পাবে।

ও, এঁরা বুঝি বাহ্লীক থেকে ফিরছেন? তা সেখানে এই সব দ্রব্যের সর্বনাশ সাধন ছাড়া আর কি এঁরা করেছেন?

আবার কি করবেন?

শুধুই যাওয়া আর আসা!

তাই বা কয় জনে পারে?

আমিও তাই বলি। তা তোমরা এত আয়োজন করেছ, একটা উপাধি দান করলে না?

অনেকে ভাবিল মস্ত ভুল হইয়া গিয়াছে। তাহারা বসন্তককে অনুরোধ করিল, দাও না দাদা একটা কিছু স্থির ক'রে।

এ আর এমন কঠিন কাজ কি? এঁদের যোগ্য উপাধি 'চরণবীর'!

'চরণবীর'—অর্থ কি?

তোমরাই তো বল্‌লে এঁরা শুধু গিয়েছেন আর এসেছেন, অর্থাৎ যা কিছু কৃতিত্ব এঁদের ঠ্যাং-এর, দেবভাষায় যাকে বলে 'চরণ,'—তাই এঁরা 'চরণবীর'।

মনে হচ্ছে তুমি বিদ্রূপ করছো?

যেভাবে নাও!

অতঃপর বিদূষক বাহ্লীকপ্রত্যাগত প্রতিনিধিগণের কাছে

আসিয়া শুধাইল, বাপুহে, ওদেশে সব আমাদের মতোই মানুষ তো? না বিশেষ কিছু আছে?

একজন বলিল—মানুষ বই কি! কিন্তু খুব উন্নত।

মানে সাড়ে তিন হাতের উপরেও আরো খানিকটা?

সে উন্নতি নয় গো!

তবে কি?

এক কথায় বল্‌তে পারবো না।

যা এক কথায় পারবে তাই না হয় বলো।

ওদেশের সকলেরই রঙ ফুট্‌ফুটে সাদা।

কাক পাখীটারও?

এবারে মনে হচ্ছে সত্যই বিদ্রূপ করছো।

ঐ তো আমার পেশা! আচ্ছা বাপু এখন আসি।

এই বলিয়া অষ্টাবক্র নামে সর্বজনপরিচিত আঁকাবাঁকা লাঠিখানায় ভর করিয়া সে প্রস্থান করিল।

একজন প্রতিনিধি বলিল—আমাদের অভ্যর্থনা উৎসবে মহারাজের আসা সম্ভব না হ'লেও যুবরাজের অন্ততঃ আসা উচিত ছিল।

অপরে বলিল—মহারাজের আসাই বা সম্ভব নয় কেন? তোড়মান তো এসেছিলেন।

কিসে আর কিসে! তিনি গুণীর আদর বোঝেন।

অতঃপর তাহারা সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

'চরণবীর' কথাটা তখন উপহাস বলিয়া মনে হইলেও

উহার মোহ অনেকেই ছাড়িতে পারিল না। সুদক্ষ পটুয়াকে দিয়া 'চরণবীর' কথাটি চিত্রভূষিত করিয়া লিখাইয়া অনেকেই নিজ গৃহে সযত্নে রক্ষা করিল। উপহাস ও সত্যকথায় প্রভেদ বুঝিবার ক্ষমতা লোপ না পাইলে মানুষের পক্ষে বিশুদ্ধ বাস্তববাদী হইয়া ওঠা সম্ভব হয় না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় অষ্টাবক্র লাঠি হাতে বসন্তক আর্যা শীলবতীর গৃহে উপস্থিত হইল।

শীলবতী বলিল—এসো বসন্তক।

আবার বৃথা পিষ্টপেষণ কেন? যে এসে উপস্থিত হয়েছে তাকে আবার 'এসো' কেন? কিন্তু কবিকেও দেখছি না, নিচুলকেও দেখছি না।

এখনি সবাই আসবে। নাও বসো।

ইতিমধ্যে কালিদাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বিদূষককে দেখিয়া বলিলেন, কি বসন্তক যে!

আজ্ঞে হাঁ, একটা আবেদন নিয়ে এসেছি।

আবেদনের স্থান তো রাজসভা!

আজকাল রাজসভার স্থান যে কোথায় সেটাই তো গবেষণার বিষয়।

কি রকম?

এতদিন ছিল মধুবল্লরীর নিকুঞ্জে, এখন শুনছি রমানীর

প্রাসাদে। শীলবতী বলিল—আর যেখানেই হোক শীলবতীর কুটীরে নয়।

বসন্তক বলিল—সেখানে কবিরাজসভা।

তা তোমার আবেদনটা কি?

আপনার প্রতাপে আমার পৈতৃক নামটা রক্ষা করা কঠিন হ'য়ে পড়েছে! কেউ আর বসন্তক বল্‌তে চায় না, বলে মাধব্য।

এমন সময়ে নিচুল প্রবেশ করিল, বলিয়া উঠিল, তুমি পৈতৃক নাম রক্ষার কথা ভাবছ, আমি ভাবছি পৈতৃক রাজ্যটা রক্ষা করা সম্ভব হবে কি না।

বলা বাহুল্য বসন্তকের কথাগুলি নিচুল শুনিতে পাইয়াছিল। কালিদাস বলিলেন, তোমার রাজ্য? নূতন শুনলাম।

নূতনও নয়, কেবল আমারও নয়, রাজ্য আপনাদের সকলেরই আছে।

কেমন?

আপনার শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কার সদাচার, ধর্ম ধারণা, ভাষা ঐতিহ্য, দেশ নগর—এই তো আপনার রাজ্য! এ রাজত্ব নেই কার?

কিন্তু হঠাৎ যাবেই বা কেন?

সব কথাই জানেন, এখনও বুঝ্‌তে পারছেন না কেন জানি না।

ওঃ তুমি শ্বেতহূনদের প্রভাব প্রতিপত্তির ইঙ্গিত করছো ? আমিও সেই উদ্দেশ্যে এসেছিলাম, বলিল বসন্তক।

তারপরে প্রাতঃকালীন অভ্যর্থনা-দৃশ্যের বিবরণ সকলের কাছে সবিস্তারে সে বর্ণনা করিল।

বসন্তক থামিল। শ্রোতা সকলেই ধীমান্, ঘটনাস্রোতের আসন্ন পরিণাম কাহারো অজ্ঞাত নয়, কিন্তু কাহারো কিছু করিবারও 'নাই, সংসারে ইহার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে ? ঝিল্লিমন্দ্রিত অন্ধকারের মধ্যে তাহারা সেখানে নীরবে বসিয়া রহিল।

বাহ্লীক হইতে প্রত্যাগত নাগরিকগণ এবারে উঠিয়া পড়িয়া সে দেশের প্রশংসায় লাগিয়া গেল। ইহার দুটি কারণ, একটি বৈষয়িক, অপরটি মানসিক, বৈষয়িক কারণটি উপেক্ষণীয় না হইলেও মানসিক কারণটাই প্রধান। তাহারা যে একটা আশ্চর্য দেশ দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনগণ যে সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তাহারা যে সেখানে অপূর্ব সমাদর লাভ করিয়াছে অর্থাৎ এতদিন পরে তাহাদের যে মূল্য যাচাই হইয়া গিয়াছে, অপরের যে সুযোগ হয় নাই, ইহাই মানসিক কারণের স্বরূপ। অশেষ দুঃখ-কষ্টবহুল সংসারে মানুষ যে বাঁচিয়া থাকে, প্রতিবেশীর মনে ঈর্ষা-সৃষ্টি তাহার ক্ষতিপূরণ করে নতুবা জীবন যাপন করিবার কষ্ট কে সহ্য করিত !

একে একে দুই হইল, দুয়ে দুয়ে চার হইল, ক্রমে চার চারশ, চার হাজার, চার লক্ষ ও চার কোটিতে পরিণত হইয়া মূলের সহিত বর্ণনার সাকুল্য রূপান্তর ঘটাইয়া দিল।

একজন বলিল, বাহ্লীকের বাড়ীগুলা সব সাততলা; অপরে বলিল, চোদ্দ তলা, তৃতীয় একজন বলিল, না চৌষট্টি তলা। একজন বলিল, ওদেশের আবাল বৃদ্ধ নরনারী শিক্ষিত, অপরে বলিল, প্রত্যেকেই বরাহমিহির বা কালিদাসের চেয়ে অনেক বেশি পণ্ডিত। একজন বলিল, ওদেশের প্রত্যেকেরই অবস্থা সচ্ছল, অপরে বলিল, আমাদের শ্রেষ্ঠী কুবের প্রভৃতি সে দেশের দরিদ্রতমের চেয়েও দীন। আর কবি পুণ্ডরীক তাহাকে প্রদত্ত মানপত্রখানা সকলকে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। সে একজনকে বলিল, একবার কোন ছুতায় ঐ লোকটাকে অর্থাৎ কিনা কালিদাসকে দেখাইয়া আনিতে পার না? তাহার নিজের সে সাহস নাই। নাগরিকগণ সে দেশে গিয়া যে সব মূল্যবান উপঢৌকন পাইয়াছিল, বলাবাহুল্য সেগুলি নিজ নিজ পত্নী কর্তৃক বেদখল হইল। সৌভাগ্যবান্ স্বামীর সৌভাগ্যবতী পত্নী প্রতিবেশী স্ত্রীলোকটিকে দেখাইল—তাহার চোখ ঈর্ষ্যায় ও লোভে জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ী ফিরিয়া মুখ বাঁকাইয়া প্রতিবেশিনী বলিল, সব ঝুঁটা, কিন্তু মনের মধ্যে ঈর্ষ্যার আগুন নিভিল না।

নাগরিকগণ নগরের চকে চত্বরে, হাটে ঘাটে যত্রতত্র অপূর্ব বাহ্লীক রাজ্যের গুণ কীর্তন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

আর বন্ধুমহলে নিভৃতে সেখানকার তরুণীগণ কিরূপ সেবা-পরায়ণ ও বশংবদ প্রকাশ করিয়া হাসির হিল্লোল তুলিল।

অচিরে এই সব প্রচারণার ফল ফলিল। যাহারা যায় নাই তাহাদের লুব্ধ কল্পনা বাহ্লীক রাজ্যকে স্বপ্নের রঙে ও স্বর্গের গৌরবে ভূষিত করিল; নিজের বাড়ীঘর, নগরী দেশ, পত্নী কলত্র তাহাদের অত্যন্ত হীন বোধ হইতে লাগিল, তাহারা কপাল চাপড়াইয়া ভাবিল, পোড়া কপাল, কি দেশেই না জন্মিয়াছিলাম।

পৃথিবীটা আগাগোড়াই যে মাটিতে তৈয়ারী, কোথাও যে একটা স্বর্গখণ্ড নাই, এই অতি স্থূল সত্য যখন লোকে ভুলিয়া যায়, এক দেশের এক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য, অপর দেশের বৈশিষ্ট্য অপর বিষয়ে, এই তথ্য যখন লোকে অস্বীকার করে, নিজ স্বদেশের নিন্দা না করিয়া অপর দেশের যখন প্রশংসা করিতে পারে না, তখন বুঝিতে হইবে পতনের কাল আসন্ন। উজ্জয়িনীর আজ সেই অবস্থা।

প্রতিদিনের মতো সেদিন সন্ধ্যাতে যুবরাজ পুরগুপ্ত রমানীর প্রাসাদে আসিয়াছেন, গভীর রাত্রি পর্যন্ত সেখানে তিনি অতিবাহিত করেন। পুরগুপ্ত রমানীর কক্ষে প্রবেশ করিলে বক্কনাস বাহির হইয়া গেল, এতক্ষণ সে রমানীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল।

পুরগুপ্ত আসন গ্রহণ করিলে রমানী স্বহস্তে মণিমাণিক্য জড়িত পাত্রে মধুর পানীয় ও খাদ্য পুরগুপ্তের সম্মুখে রাখিল।

যুবরাজ বলিলেন, রমানী তোমাদের দেশের যে জয় জয়কার।

কেন মহারাজ!

তারপরে হাসিয়া সংশোধন করিয়া বলিল, কেন যুবরাজ!

যারা তোমাদের দেশে গিয়েছিল তারা যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গুণগ্রাহিতা কি গুণ নয়? তারা নিজের গুণেই আমাদের দেশকে প্রশংসনীয় দেখেছে। তা ছাড়া, আমাদের যে-সব লোক এ দেশ থেকে ওদেশে যায় তারাও তো উজ্জয়িনীর প্রশংসা করে, বিশেষ করে এ দেশের শিক্ষা-দীক্ষার। উজ্জয়িনীর নাগরিকগণ তো স্বচক্ষে দেখে এসেছে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদির অনুবাদ।

তা দেখেছে বটে।

রমানীর কথাগুলি সর্বৈব মিথ্যা কোন শ্বেতহূন এ পর্যন্ত স্বদেশে ফিরিয়া উজ্জয়িনীর প্রশংসা করে নাই। বরঞ্চ সকলেই নিন্দা করিয়াছে, বলিয়াছে যে উজ্জয়িনীর রাজশক্তি দুর্বল, প্রজাপুঞ্জ অসন্তুষ্ট, রাষ্ট্রবন্ধন শিথিল, এখন একটা শক্ত রকম ধাক্কা দিতে পারিলেই কার্যসিদ্ধি হয়। কিন্তু এসব কথা পুরগুপ্ত জানিবেন কি প্রকারে? তাঁহার চক্ষে রমানী বড় সুন্দর, তাঁহার রসনায় বাহ্লীকের সুরা বড় মধুর; তিনি

মোহগ্রস্ত, তাঁহার প্রধানামাত্যগণ কৃতঘ্নতার প্রান্তে উপনীত, বাহ্লীকপ্রত্যাগতগণ শ্বেতহূনের অনুকূলে এবং উজ্জয়িনীর প্রতিকূলে প্রচারকার্যে লিপ্ত। একমাত্র যে ব্যক্তি ইহার প্রতিকারে সমর্থ ছিল অদৃষ্টের চক্রান্তে সে আজ দীর্ঘকাল নির্বাসিত।

রমানী বলিল, যুবরাজ আমার একটা প্রার্থনা আছে।

তোমাকে অদেয় কি থাকতে পারে, কি চাই বলো?

উজ্জয়িনী বাহ্লীক মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে উজ্জয়িনীর নাগরিকদের নিয়ে একটা মৈত্রীবাহিনী গঠন করতে চাই।

মন্দ কি!

আপনার ভালো লাগলে অবশ্যই ভালো, আমাদের দেশে অনেকদিন হ'ল এরকম মৈত্রীবাহিনী গঠিত হয়েছে।

তারা করে কি?

উজ্জয়িনীর অনুকূলে প্রচারকার্য ক'রে বেড়ায়, উজ্জয়িনীর শিক্ষা সাহিত্য শিল্পকার্য প্রভৃতির প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করে, উজ্জয়িনীর কাব্য আবৃত্তি ও সঙ্গীত গান করে—সঙ্গে অন্যান্য সৎকার্যও ক'রে থাকে।

কথাগুলি সর্বৈব মিথ্যা।

পুরগুপ্ত বলিলেন, চমৎকার প্রস্তাব। তুমি অচিরে কার্য আরম্ভ ক'রে দাও, অর্থাভাব হবে না।

রমানী বলিল—রাজকোষের অর্থ নিলে চলবে না।

আমাদের দেশে এ জাতীয় কার্যকে বলে লোকব্রত। লোক-ব্রত সাধারণ লোকের অর্থে সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনেক অর্থের যে আবশ্যক হবে।

লোকে সে আনুকূল্য করবে।

তা' হ'লে বলো যে বহুলোক তোমাদের অনুকূল।

আপনি যার অনুকূল তার প্রতিকূলতা করবে কে?

এই বলিয়া সে হাসিল। সে-হাসি পুরগুপ্তের চোখে স্বর্গমরীচিকার সৃষ্টি করিল।

পুরগুপ্ত বলিলেন, রমানী আমি ক্লান্ত।

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রমানীর বাহু আশ্রয় করিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

সেদিন নগর মধ্যে মহাকালজীর চকে বাজার বসিয়াছে যেমন প্রতিদিন বসে। আদিবাসী রমণীরা দূর দূরান্ত হইতে ঝিঙা, লাউ, কুমড়া, প্রভৃতি তরিতরকারি বেচিতে আসিয়াছে। একদিকে পিতল কাঁসা প্রভৃতি তৈজসের বিপণি। তার পাশেই সুলভ মূল্যের রূপার চুড়ি, মল, ঝুমকার দোকান। একদিকে তাঁতের ধুতি শাড়ী, সস্তা ও দামী, নানা শ্রেণীর। আর একদিকে হাড়ের, শিঙের, হাতীর দাঁতের খেলনা ও শিল্পদ্রব্য। কোথাও বা স্তূপীকৃত যব গম ও অড়হর ছোলা। একস্থানে প্রচুর তেলেভাজা বিক্রয় হইতেছে সেখানে বড়

ভিড়। পেড়া, মিঠাই, জিলাপি প্রভৃতির দোকানের সংখ্যাও কম নয়। বিভিন্ন পরিচ্ছদে বিচিত্র নরনারীর সংখ্যা অগণ্য। দুটি বালকে একটি বাঁশের বাঁশীর স্বামীত্ব লইয়া কাড়াকাড়ি চলিয়াছে। বচসা, দর-দাম, আলাপ আলোচনা, হাঁকডাক সবসুদ্ধ মিলিয়া হট্টগোল।

চকের মধ্যে চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া নবগঠিত বাহিনীর এক যুবক বক্তৃতা করিতেছে, তাহার উষ্ণীষে একটি শ্বেতকহ্লার। কেহ শুনুক বা না শুনুক পরম ধৈর্য সহকারে সে যন্ত্রবৎ বলিতেছে—ঐ যে ভিক্ষুকটা ওখানে ব'সে ভিক্ষা করছে, কেউ একটা কড়ি দিচ্ছে, কেউ দিচ্ছে না, সারাদিন পরে ভগ্ন কুটিরে ফিরে হয়তো ওর একমুঠো অন্ন জুটবে হয় তো জুটবে না, আহা ওর কি দুঃখ? কেন এমন হয়! এ আমাদের দেশের দোষ কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র এমন নয়। বাহ্লীক রাজ্যে ভিক্ষুক নেই, সেখানে কেউ নিরন্ন রাত্রি যাপন করে না। নিতান্ত হতদরিদ্রের জন্যও সেখানে রাজকীয় ব্যবস্থা বর্তমান। সেই ব্যবস্থার ফলে সেখানে দরিদ্রগণ আহার, বাসস্থান পায় কিন্তু তেমন লোকের সংখ্যা নেই বল্‌লেই হয়। আমাদের নগর থেকে বাহ্লীকরাজ্যে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা এ সব স্বচক্ষে দেখে এসেছেন।

তাহার বক্তৃতায় কেহ বড় কর্ণপাত করিতেছে না। দু'চার জন এক লহমার জন্য দাঁড়াইতেছে কিন্তু যখন বুঝিতে পারিতেছে যে দৈব ঔষধের বিজ্ঞাপন নয় তখনি সরিয়া

যাইতেছে। কিন্তু যুবকটির এমনি নিষ্ঠা যে লোকের উদাসীন-তাতেও সে নিরুৎসাহ বোধ করিতেছে-না।

বাজারের মধ্যে কয়েকটি সুন্দরী সুসজ্জিতা যুবতী কারুকার্যখচিত পাত্র হাতে সাধিয়া বেড়াইতেছে, বাহ্লীক-উজ্জয়িনী মৈত্রী দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে এক কার্ষা পণ দাও। কাহাকেও বলিতেছে মা, কাহাকেও ভাই, কাহাকেও বহিন, কাহাকেও তাত। কেহ এক আধটা কড়ি দিভেছে, কেহ দিতেছে না, কিন্তু কেহই এই অভিনব ভিক্ষার ও তাহাদের বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারিতেছে না।

ভিড়ের মধ্যে একজায়গায় পল্টু ও হরি নামে দুইজন ভিক্ষুক বসিয়া ভিক্ষা করিতেছে। ঠিক ঐ জায়গাটিতে তাহারা দশ বৎসর বসিয়া আসিতেছে, আগে তাহাদের দুইজনের বাপ ঐখানে বসিয়া ভিক্ষা করিত, উত্তরাধিকার সূত্রে এখন স্থানটিতে তাহাদের অধিকার।

পল্টু বলিল—ভাই এ ব্যবসা আর চল্‌লো না।

হরি। কেন? কেন?

পল্টু। ওরা ব্যবসায়ে নামলে আমাদের আর কে ভিক্ষে দেবে?

এই বলিয়া সে যুবতীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

হরির একটা চোখ কাণা—উহাই তাহার প্রধান মূলধন, সে সেই কাণা চোখটায় নষ্টদৃষ্টি সঞ্চারিত করিয়া বলিল —কই আমি তো কিছু দেখ্‌তে পাই না।

পল্টু। কাণা চোখটায় কি দেখবে? একবার ভালো চোখটায় চেয়ে দেখো না।

এবারে হরি দেখিতে পাইল, বলিল, কি বলিস তুই, ওরা ভিক্ষে করবে কেন? ওরা যে ভিক্ষে দেবে।

পল্টু। বেশ তো একবার গিয়ে দেখো না।

তখন হরি একটি যুবতীর কাছে গিয়া বলিল, মা একটা কড়ি দাও।

'মা' সম্বোধন শুনিয়া মেয়েটির রাগ হইল, সে বলিল, 'মা!' চোখে দেখ্তে পাও না?

হরি বলিল—তোমারও দেখছি আমার দশা!

কেন?

আমার যে এক চোখ কাণা তা যখন দেখতে পাচ্ছ না তখন তুমিওতো কাণা।

মেয়েটির খুব রাগ হইয়াছিল। কিন্তু মৈত্রী-বাহিনীর একটি প্রধান বিধান এই যে রাগের কারণ ঘটিলেও কেহ কখনও রাগ প্রকাশ করিতে পারিবে না, সর্বদা মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। তাই মেয়েটি রাগ চাপিয়া বলিল—একচোখে তো দেখতে পাও, তবে 'মা' বল্লে কোন্ আক্কেলে!

এক চোখে দেখ্তে পেলাম বলেই তো 'মা' বল্লাম।

দু চোখে দেখতে পেলে তবে কি বলতে?

হরি নির্বিকার ভাবে বলিল—দিদিমা।

পাছে রাগ প্রকাশ হইয়া যায় মেয়েটা দ্রুত অন্যত্র প্রস্থান করিল।

হরি পল্টুর কাছে ফিরিয়া গিয়া বলিল—না, ভাই ওরা ভিক্ষে ব্যবসায়ে আমাদের সঙ্গে পারবে না।

কি ক'রে বুঝলে ?

আরে ভিক্ষুকের কি কথা কাটাকাটি করলে চলে, না, ছুটো কড়া কথা শুনলে রেগে অন্যত্র সরে যাওয়া চলে!

বেশ বলেছ ভাই প্রাণটা শান্ত হল। কিন্তু ওদের এ রকম ব্যবহারের মানে কি ?

মানে আর কি শখ? বড়লোক কাজ নেই—আচ্ছা একবার শখের ভিক্ষে ক'রেই দেখি না কেন?

যাক্ ভাই বাঁচা গেল।

এমন সময়ে অদূরে একজন শ্রেষ্ঠীকে দেখিয়া তুইজনে সমস্বরে স্থুরু করিল—অন্ধ নাচার বাবা, ছুটো কড়ি দাও বাবা, মহাকালজী তোমার বাড়বাড়ন্ত করবেন বাবা, ধনেপুত্রে তোমার ঘর ভ'রে যাবে বাবা—ইত্যাদি।

শ্রেষ্ঠী তাহাদের দিকে ছুটো কড়ি ছুঁড়িয়া দিয়া অপস্রিয়মান সেই যুবতীটির দিকে ধাবমান হইল।

কিছুদিন হইল যুবরাজ পুরগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায়, রমানী, বক্কনাস ও শ্বেতহূনসমাজের শিক্ষায় উজ্জয়িনীতে মৈত্রীবাহিনী গঠিত হইয়াছে। বহুশত যুবক ও যুবতী

মৈত্রীবাহিনীভুক্ত। তাহাদের প্রত্যেকে মাসিক মোটা বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। তবে এমনি মন্ত্রগুপ্তি যে কে কত পায় অপরে জানে না,আর এ অর্থ কোথা হইতে আসে তাহাও কেহ জানে না। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে মৈত্রীবাহিনীর সদস্যগণ শিক্ষিত বুলি বলে—লোকসেবার অর্থ লোকে দেয়, দেখ নাই আমরা পথে ঘাটে ভিক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু গণিত শাস্ত্রের দয়ামায়া নাই, ভিক্ষালব্ধ কড়ি ও কার্যাপণ মাসিক সাকুল্য বৃত্তির ধারে কাছেও পৌঁছাইতে যে অক্ষম এ কথা বাহিরের লোক জানিবে কি প্রকারে? এ রহস্যের সদুত্তর কেহই জানে না, অনেকে অনেক রকম অনুমান ও সন্দেহ প্রকাশ করে, কিন্তু কখনো সে সব অনুমান ও সন্দেহ প্রমাণের আওতায় আসিবে না। সংসারে অনেক বড় কথারই প্রমাণ নাই, তবু তো সংসার চলে, তবু তো সে-সব কথা মিথ্যা হইয়া যায় না।

মৈত্রীবাহিনীর কার্যাবলীর দু' একটি চিত্র আমরা উজ্জয়িনীর বাজারে দেখিতে পাইয়াছি। উহাই তাহাদের কাজের রীতি ও প্রকৃতি। যত্রতত্র প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে উজ্জয়িনীর নিন্দা ও বাহ্লীকের প্রশংসা তাহাদের কাজের ধুয়া। অপরকে মুগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ প্রথমে মোহময় বাক্য বলিতে শুরু করে আর অবশেষে নিজ বাক্যের মোহে নিজে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সে নেশা আর ভাঙে না। বহুশ্রুত মিথ্যা কালক্রমে সত্যে পরিণত হয়।

মৈত্রীবাহিনীর কার্যকলাপ বড় বিচিত্র, যেমন বিচিত্র তেমনি চমকপ্রদ। কোন একটা উপলক্ষ্য জুটিলেই তাহারা শ্বেতকহ্লার শোভাযাত্রা করিত। শ্বেতকহ্লারধারী শত শত সুসজ্জিত যুবক যুবতী শোভাযাত্রায় বাহির হইত। সঙ্গে সঙ্গে চলিত লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত আর 'শ্বেতকহ্লার' 'শ্বেতকহ্লার' সিংহনাদ। আবার যখন তখন 'শ্বেতকহ্লার' দিবস উদ্‌যাপন মৈত্রীবাহিনীর সাধারণ কর্ম-পদ্ধতির অঙ্গ। ঐ সব উৎসবের প্রধান অঙ্গ যাত্রাগান, কথকতা, পাঁচালী, মুখোস-নৃত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি। শ্বেতকহ্লার দিবস পালনের সময়ে বাহিনীর যুবক যুবতীগণ দলে দলে রাজপথে বাহির হয়, আর পথচারীকে একটি করিয়া শ্বেতকহ্লার পুষ্প উপহার দিয়া থাকে। বলা বাহুল্য এইসব বিচিত্র তামাসা দেখিবার লোকের অভাব হয় না, লোক জমিয়া গেলেই বাহিনীর সদস্যগণ বাহ্লীকের প্রশংসা ও উজ্জয়িনীর নিন্দায় শতমুখ হইয়া ওঠে।

মৈত্রীবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র শ্বেতকহ্লার নামে একটি অট্টালিকা। আগে বাড়ীটির নাম ছিল 'চূর্ণবাড়ী', এক সময়ে সেখানে চূর্ণের আড়ৎ ছিল। এখন তাহার নামকরণ হইয়াছে শ্বেতকহ্লার। এখানে আরাম ও বিলাসের সামগ্রী পুঞ্জীভূত, আহারবিহারের যাবতীয় উপাদান এখানে সুপ্রচুর। এ সমস্তই লোকভিক্ষার অর্থে নাকি সংগৃহীত! মাঝে মাঝে এখানে ভিক্ষুক আসে, ভিক্ষা চায়, কিন্তু উত্তর

পায়, 'খেটে খাও।' একদিন এক বৈরাগী আসিয়া ভগবানের নাম গান করিয়া পরে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাহিয়াছিল —উত্তর পাইয়াছিল, 'খেটে খাও'। তদুত্তরে বৈরাগী বলিয়াছিল, 'কেন বাপু, ভগবানের নাম গান করা কি কাজ নয়?' আর একদিন ঐ পথে রাজবিদূষক বসন্তক যাইতেছিল, একজন সদস্য তাহাকে বলিয়াছিল—এইসব পরান্নভোজীর স্থান এ রাজ্যে হওয়া উচিত নয়। বসন্তক বলিয়াছিল— তোমরা যে কার অন্ন খাও তার হিসাব কে রাখে!

মৈত্রীবাহিনীর প্রচারকার্যের ফলে সুখসৌভাগ্যের আশায় দলে দলে লোক শ্বেতহূনসমাজের অনুকূল হইয়া উঠিতে লাগিল, অবশ্য যুবরাজ ও প্রধান অমাত্যগণের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা অনুকূলতার একটি প্রধান কারণ। তারপর শ্বেতহূনসমাজের সৌভাগ্য চরমে উঠিল যখন মহামাত্য সুরপাল নিয়মিত রমানীর আসরে আসিতে লাগিলেন—আগে তিনি ছিলেন মধুবল্লরীর পৃষ্ঠপোষক। এখন যুবরাজ, মহামাত্য ও মহাদণ্ডনায়ক তিনজনেই রমানীর অনুকূল হইয়া ওঠায় সমগ্র উজ্জয়িনী নগরীর রাজশক্তি রমানীর কবলভুক্ত হইল। এক সময়ে রমানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মধুবল্লরী, এখন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং মহারাজ বুধগুপ্ত। বুধগুপ্তের রাজসভা শক্তির মুখোস মাত্র, এখন শক্তির মুখ্য-কেন্দ্র রমানীর মণিকুট্টিম প্রাসাদ। অশেষ-ছলাকলাময়ী রমানী বক্রনাসের ইঙ্গিতে শ্বেতহূনসমাজের প্রতি অনুকূল

নাগরিকগণকে প্রধান প্রধান রাজকার্যে নিয়োগের জন্য যুবরাজ, মহামাত্য ও মহাদণ্ডনায়ককে অনুরোধ করিতে লাগিল—এবং সে সব অনুরোধ ব্যর্থ হইল না। ফলে অচির-কাল মধ্যে অমাত্য, মন্ত্রী, কুমারামাত্য, সন্ধিবিগ্রহিক, সর্বাধিকারী, মহাপ্রধান, মুখ্যপ্রধান, পুরোহিত প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রধান পদ রমানীর অনুগৃহীত ব্যক্তিতে পূর্ণ হইল। মৈত্রীরসের পিচ্ছিল পথে রাজপুরুষগণ ছুটিয়া চলিল—রমানীর মদিরোজ্জ্বল চাপা কটাক্ষের দিকে মুগ্ধ মূঢ় পতঙ্গের মতো।

মধুবল্লরীর সুসজ্জিত প্রাসাদে অনুগ্রহপ্রার্থীর সংখ্যা কমিতে লাগিল। প্রথমে সে লক্ষ্য করে নাই, পরে করিল, ভাবিল যাক, যারা যাইবার তারা যাইবেই, বাজে লোকের ভিড় জমাইয়া কি লাভ? একদিন মহামাত্যের অনুপস্থিতি সে লক্ষ্য করিল; একদিন, দুইদিন, দশদিন; সে চিন্তিত হইয়া উঠিল, মহামাত্য তো বাজে লোক নয়, তাহার বিপুল প্রভাবের কারণ। তারপরে বিশ্বস্ত পরিচারিকার মুখে আসল কারণ শুনিল, মহামাত্য অসুস্থ বা নগরে অনুপস্থিত নন, তিনি এখন নিয়মিত রমানীর আসরে যাতায়াত করিতেছেন। হিংসায় ও ক্রোধে তাহার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, সে গাত্রোত্থান করিল।

পরিচারিকা শুধাইল—কোথায় যাও ?

কাজ আছে চল্‌লাম।

আমি সঙ্গে আসবো ?

না তুই থাক্‌।

এই বলিয়া মধুবল্লরী রমানীর প্রাসাদশিখরের আলোক লক্ষ্য করিয়া দ্রুত চলিল। তখন রাত্রি গভীর।

পানাহারের পরে যুবরাজ পুরগুপ্ত বিদায় লইয়াছেন, রমানীরও নৈশ আহার সমাধা হইয়াছে, সে আপন মনে নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া একটি কাঠির সাহায্যে দাঁত খুঁটিতেছিল। এমন সময়ে 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে মধুবল্লরী প্রবেশ করিল। রমানীর প্রাসাদে ইহাই তাহার প্রথম পদার্পণ। রমানী তাহাকে দেখিয়া প্রথম নজরেই বুঝিল আজ একটা পরীক্ষা। কিন্তু সে ভাব মনে গোপন করিয়া তাড়াতাড়ি কাঠিখানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—হাসিয়া বলিল, এসো বহিন এসো, আজ তোমার পায়ের ধূলোয় আমার বাড়ী ধন্য হল।

কিন্তু ও-রকম মধুর স্বাগতে অভিভূত হইবার পাত্র মধুবল্লরী নয়। মিষ্ট বাক্যের স্রোত দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—ছলনার ব্যবসা আমিও করি, আমাকে ওতে ভোলাতে পারবে না। ওসব তুলে রেখে দাও বোকা পুরুষ মানুষগুলোর জন্য। বলি তুমি চাও কি ?

রমানী যে ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে আত্মসংযম তাহার

প্রধান মূলধন, হঠাৎ রাগিলে, হঠাৎ অভিভূত হইলে তাহার চলে না। সে বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—আগে ব'সো বহিন, তারপরে সব বল্‌বো।

মিষ্টালাপ রাখো, আমার কথার উত্তর দাও আগে।

বহিন তুমি খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছো, এক পাত্র মাধ্বী আনতে আদেশ করবো ?

তোমার মাধ্বী ও মধুবাক্য দুই-ই তুলে রাখো যুবরাজের

এবারে রমানী একটু খোঁচা দিল, বলিল, যুবরাজ তো নিত্য পায়ের ধূলো দিয়ে থাকেন। সম্প্রতি মহামাত্যও পায়ের ধূলো দিচ্ছেন, আমার মাধ্বী তাঁর বড় প্রিয়—

আশা করি তোমার মধুবাক্যও তাঁর কম প্রিয় নয়।

তোমার আশা ভঙ্গ করতে চাইনে, তোমার অনুমান যথার্থ।

কেন তাঁকে মধুর বাক্যে মুগ্ধ করবার ফাঁদ পেতেছ ?

পুরুষের পৌরুষের পক্ষে ওটা যে অত্যন্ত অপরিহার্য। তা ছাড়া আগে যেখানে যেতেন সেখানে খুব সম্ভব ও-বস্তু জুটতো না।

সেখানে জুটতো ঠিকই।

তবে সে স্থান ছাড়লেন কেন ?

তোমার ছলনায়।

সে তো তোমার অনুমান মাত্র। তা আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে তাঁকে কাছে সন্ধান নিলেই পারতে।

দেখো রমানী দুটো সত্য কথা বলি, আর যদি সাহস থাকে তবে দুটো সত্য কথা শোনো। আমার মধুর বাক্যে পুরুষের হৃদয়কে মাত্র মুগ্ধ করে। তোমার মধুর বাক্যের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র।

কি সেটা শুনতে পারি কি?

তুমি রাজপুরুষদের মুগ্ধ ক'রে রাজক্ষমতা করায়ত্ত করবার উদ্যোগী।

আমার প্রয়োজন কি?

সে কথা আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো।

তোমার কম জানাটা কতদূর যায় তবু একবার শুনি।

তবে শোনো। তুমি শ্বেতহূনসমাজের পুরুষ-ধরা ফাঁদ রাজপুরুষগুলোকে ফাঁদে ফেলে শ্বেতহূন রাজ্যের প্রভাব বৃদ্ধি তোমার উদ্দেশ্য।

কিন্তু কেন?

এ রাজ্য তোমরা গ্রাস করতে চাও।

তার সদুপায় যুদ্ধ নয় কি?

সে চেষ্টা তো আগে হয়েছে, এখনো তোমাদের পিঠের ক্ষতচিহ্ন শুকোয়নি। তাই নূতন পন্থা ধরেছ।

কি সেই নূতন পন্থা, মহামাত্যানী?

অরাজকতা সৃষ্টি, রাষ্ট্রতন্ত্রে শিথিলতা সৃষ্টি।

এ সত্যই নূতন।

নূতন কি পুরাতন জানিনা, এই ভাবেই তোমরা চাও যুদ্ধের উদ্দেশ্য অভ্যন্তরীন অরাজকতার দ্বারা সাধন করতে।

তুমি উন্মাদ তাই এমন বলছো।

আমি প্রকৃতিস্থ বলেই এমন বলছি।

যদি সত্যই তাই হয়, তবে এই রাজনীতির মধ্যে নারীর স্থান কোথায়?

নারীর স্থান নাই, কিন্তু বারাঙ্গনার স্থান আছে।

তবে কি তুমি বল্‌তে চাও আমি—

তাহার বাক্য শেষ হইবার আগেই বারাঙ্গনার যতগুলি প্রতিশব্দ জানাছিল সব এক নিশ্বাসে মধুবল্লরী বলিয়া ফেলিল, বলিল, তুমি বারাঙ্গনা, বেশ্যা, পতিতা, সাধারণী নায়িকা, তুমি—

তাহার বাক্য শেষ হইবার অবকাশ পাইল না, ক্ষিপ্ত পশুর মতো রমানী তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তবে রে মাগী আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

আয়, মুখপুড়ী দেখি কার গায়ে কত জোর।

তখন উভয়ের মুখ হইতে ডাইনি, শাঁকচুন্নি, আখামুখী, শতেকখোয়ারী প্রভৃতি নারীর গার্হস্থ্যাভিধানের যাবতীয় মূল্যবান অভিধাগুলি পরস্পরের উদ্দেশে বর্ষিত হইতে লাগিল, উপরি চলিল উভয়ে চুলোচুলি। বিধাতা সাধারণতঃ নারীর বাহুতে বল দেন না, তার বদলে মুখে বিষ দেন। কিন্তু

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সহজলভ্য অন্নে পুষ্ট হওয়ায় বাহুবলেরও অপ্রতুলতা ছিল না। শ্বেত পাথরের মেঝের উপরে দুইজনে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গড়াইতে লাগিল, পরস্পরের চুল ও বস্ত্র ছিঁড়িতে লাগিল এবং নখদন্তের আঘাতে মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিল। তাহারা পরস্পরের উদ্দেশে যে সব বাক্য ও অভিধা প্রয়োগ করিতে লাগিল উজ্জয়িনীর বাজারের মৎস্যজীবীনী নারীগণও তাহা হইতে নূতন সম্পদ আহরণ করিতে পারে। উজ্জয়িনীর দুই বিদুষী নারীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আভিজাত্য এক মুহূর্তে সাপের নির্মোকের মতো খসিয়া পড়িল।

নিরপেক্ষ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের কি পরিণাম হইত বলা যায় না, হয় তো একতর বা উভয়েই প্রাণ না হারানো অবধি দ্বন্দ্ব চলিত। কিন্তু ক্ষেত্র তো নিরপেক্ষ নয়, রমানীর প্রাসাদ। হুড়াহুড়ির শব্দে তাহার পরিচারিকাগণ উঁকি মারিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদেরও অভ্যস্ত ভদ্রতা খসিয়া পড়িল। একজন বলিল—ও দিদিমণি কি করবো বলো।

অপরা বলিল, ওমা, এ যে কালসাপের ছানা।

আর একজন বলিল, দৌবারিককে ডাকবো নাকি?

চতুর্থী বলিল, আমরা থাকতে আবার দোবে চোবে কেন?

মধুবল্লরী তখন রমানীকে ভূপাতিত করিয়া নূতন উদ্যমে তাহার গালে নখ বসাইয়া দিতেছে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে

রমানী বলিল, ও মল্লিকা তোরা ও-ঘর থেকে আমার বড় কাঁচিখানা নিয়ে আয় আর সকলে মিলে ডাইনিটাকে চেপে ধর্।

মুহূর্তমধ্যে তাহার আদেশ পালিত হইল। সকলে মিলিয়া মধুবল্লরীকে চাপিয়া ধরিলে রমানী গাত্রোত্থান করিয়া সেই তীক্ষ্ণ কাঁচির সাহায্যে মধুবল্লরীর মৌসুমী মেঘমালা সদৃশ কেশপাশ একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিয়া দিল। সেই ভূলুণ্ঠিত কুঞ্চিত মসৃণ কৃষ্ণ কেশ-স্তবক দেখিয়া মধুবল্লরী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিহত হইলেও বোধকরি তাহার এত দুঃখ হইত না। নারীর কায়িক সৌন্দর্যের হানিই যে তাহার অপমানের চরম—এ নিদারুণ রহস্য নারী ছাড়া কে জানিবে!

ক্ষতবিক্ষত দেহ, ছিন্নভিন্ন বস্ত্র—মধুবল্লরী রমানীর প্রাসাদ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দ্বারের কাছে ভিত্তি-গাত্রে সংলগ্ন একখানি দর্পণের কাছে সে মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল—এ ছায়া কোন্ বালকের? বহুদিন পূর্বে মৃত যমজ ভ্রাতার মুখ তাহার মনে পড়িয়া গেল। দ্বিগুণ বেগে তাহার অশ্রুধারা বহিল, ঘনান্ধকার রাজপথ ধরিয়া বাণাহত মৃগীর মতো সে ছুটিয়া চলিয়া গেল লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের দিকে, মন্দিরদ্বারের একটি চাবি তাহার কাছে থাকিত। দরজা খুলিয়া বিগ্রহের পদপ্রান্তে সে মাথা কুটিতে লাগিল, নারায়ণ, নারায়ণ, এই কি তোমার

বিধান! এতকাল যে তোমার সেবা করলাম এই কি তার পুরস্কার!

তারপরে লক্ষ্মীর দিকে তাকাইয়া বলিল, মা আমার সর্বস্ব নে, কেবল আমার চুলগুলো ফিরিয়ে দে! মা, চুল-গুলো ফিরিয়ে দে!

পাষাণে মাথা কুটিতে কুটিতে যখন কপালে রক্ত বাহির হইল তখন তাহার সম্বিৎ ফিরিল। যেমন দ্রুত আসিয়াছিল, তেমনি দ্রুত প্রস্থান করিল। কোথায় গেল কেহ জানিল না, পরদিন তাহাকে উজ্জয়িনীতে আর কেহ দেখিতে পাইল না, মধুবল্লরী আত্মগোপন করিল।

গিরিসানু হইতে সমতলে সদ্য অবতীর্ণ সিন্ধুনদের বর্ষা-স্ফীত বারিরাশি মরীয়া হইয়া ছুটিয়াছে। পান্নাতরল তরঙ্গরাজি একটি আর একটিকে অতিক্রম করিবার প্রতি-যোগিতায় মত্ত, উন্মত্ত ফেনকহ্লার দুরন্ত বেগে ধাবমান; নৌকাবিহীন বিপুল জলরাশির অবিচ্ছিন্ন গর্জন অনাদ্যন্ত ওঙ্কারনাদের মতো চরাচর আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। সেই গিরিদ্বীপটি তীরভূমি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাহার পূর্ব-পশ্চিমে সুদূরবিস্তৃত নদের দূর প্রান্তে কুহেলিকার মতো তীরলেখা; আর উত্তরে দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে একটি অতিকায় সবুজ মৃণালের মতো সিন্ধুনদের জলরাশি বিস্তারিত।

বর্ষার কয় মাস দুস্তর নদের ব্যবধান জন্য ভক্তজনে সেই গিরিদ্বীপে খাদ্য পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। পুষ্য-ভূতির জীবন যাপন সেখানে অসম্ভব হইত, কিন্তু এক বিচিত্র উপায়ে তাঁহার আহার্য জুটিয়া থাকে। পাহাড়ের খোপে খাপে বাদুড়, চিল, শকুন প্রভৃতি পাখীর বাসা। তাহারা বাদাম, ডুমুর ও অন্যান্য জাতীয় ফল লইয়া আসে। তাহারই কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পুষ্যভূতি জীবন রক্ষা করেন। তপস্বীর আহার পক্ষীর আহার। তীরবর্তী গ্রামের লোকেরা ভাবিয়া পায় না এ কয় মাস গিরিশঙ্কুর যোগী পুরুষ কিরূপে জীবনধারণ করেন। অবশেষে তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে যোগীবর যোগবলে খাদ্য সংগ্রহ করেন। তাহাদের ভক্তি আরও বাড়িয়াছে।

আর কিছুদিন আগে হইলে মধুবল্লরীর আকস্মিক অন্তর্ধান নগরে বিস্ময়োৎপাদন করিত। কিন্তু এখন সংবাদটা কেহ জানিতেও পারিল না। তাহার অনুরাগী রাজপুরুষগণ একে একে সরিয়া পড়িয়াছে কাজেই তাহাদের জানিবার কথা নয়। দেবদাসীগণ অবশ্য জানিল, কিন্তু জানিল না তাহাদের প্রধানা কোথায় গেল, কেন গেল। তাহারা কানাকানি করিল, তারপরে সব নীরব। ঐ পর্যন্তই। কিছু দিন হইতে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে মধুবল্লরীর আগের সে প্রতাপ আর নাই, তারপরে

মহামাত্যের পক্ষ পরিবর্তনে তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে কেবল মধু-বল্লরীর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিল না, ঐ সঙ্গে তাহাদেরও সৌভাগ্যলক্ষ্মী টলিল। তারপরে আসিল তাহার অপ্রত্যাশিত অন্তর্ধান। তাহারা কারণটা না বুঝিলেও অনুমান করিল, অনুমানের সঙ্গে আসিল সন্দেহ, সন্দেহের সঙ্গে ভীতি, অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহারা হতবুদ্ধি ও হতবাক্ হইল। রমানী ও শ্বেতহূনসমাজের অপ্রীতিভাজন ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে অন্তর্হিত হয়, তাহাদের আর সংবাদ পাওয়া যায় না, এ সব কথা তাহারা কানাঘুষায় শুনিয়াছিল। মধুবল্লরীর অন্তর্ধানকে তাহারা সেই পর্যায়ে ফেলিল। এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিয়া লাভ নাই তাহারা জানিত, শুধু তাহাই নয় ভয়ের আশঙ্কাও যথেষ্ট। তাহারা জানিত যে রমানী, বক্কনাস বা শ্বেতহূনসমাজের অপ্রীতিভাজন কথা কেহ উচ্চারণ করিবামাত্র মৈত্রীবাহিনী তাহার বিরুদ্ধে মৌখরি রাষ্ট্রের গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ উত্থাপন করে ও প্রমাণ উপস্থিত করে। অমনি শত্রুরাষ্ট্রের সহায়তা করিবার অভিযোগে সে ব্যক্তি দণ্ডিত হয়, কিম্বা একেবারেই চিহ্নমাত্র না রাখিয়া লুপ্ত হইয়া যায়। কাজেই সব দিক্ বিচার করিয়া মধুবল্লরী সম্বন্ধে তাহারা বিহ্বল নীরবতা অবলম্বন করিল।

দুর্বলায়মান গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রান্তিকে মৌখরিরাষ্ট্র তখন

মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারাই যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রধান শত্রু, এই বোধটি শ্বেতহূনগণের প্ররোচনায় তখন যুবরাজ ও রাজপুরুষগণের মনে বেশ কায়েম হইয়া বসিয়াছে।

দেবদাসীগণের অনেকেই ক্রমে ক্রমে নগর ত্যাগ করিল, দু'চার জন মাত্র লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি ভক্তিবশত রহিয়া গেল।

আকর্ণবিস্তৃত ধনুকের ছিলায় যেমন একটা উদ্যত ভাব ফুটিয়া ওঠে, অল্প একটু আঘাতে যেমন টঙ্কার ধ্বনিত হয় আজ উজ্জয়িনীর ঠিক তেমনি অবস্থা হইয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিত কোন একটা বিরাট পরিবর্তনের জন্য নগর প্রস্তুত, কোন বৃহৎ ভাববিপর্যয়ের মুখে আসিয়া পড়িয়া নগর যেন ব্যথায়, আশঙ্কায়, অনিশ্চয়তায় টন্ টন্ করিতেছে। কিন্তু কি সেই পরিবর্তন, কি সেই ভাববিপর্যয়, কোন্ রন্ধ্রে বন্যার আবির্ভাব হইবে কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহাতে আশঙ্কার মাত্রা কেবল বাড়িত। কালবৈশাখীর পূর্ব মুহূর্তে নিশ্চল নিস্তব্ধ অসাড় ধরিত্রী যেমন চোখ কান বুজিয়া অসহায়ভাবে পড়িয়া থাকে উজ্জয়িনী তেমনি ভাবে পড়িয়া রহিল। অন্যথা নিস্তব্ধ নগরীর বুকে এক মাত্র ধ্বনি বাহ্লীক-উজ্জয়িনী মৈত্রী দৃঢ়তর হোক—সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। ক্রন্দনপর শিশুকে মাতা ভয় দেখাইত, চুপ, চুপ ওরা আসছে। অবোধ শিশু অর্ধব্যক্ত

ক্রন্দনের রব সম্বরণ করিয়া থামিত। ওরা পথ দিয়া সগৌরবে, সদর্পে হাঁকিয়া যাইত 'বাহ্লীক উজ্জয়িনী মৈত্রী দৃঢ়তর হোক।' অর্গল রোধ করিতে করিতে নাগরিকগণ বলিত, চুপ, চুপ ওরা আসছে; বাতায়ন বন্ধ করিতে করিতে ললনাগণ বলিত, চুপ, চুপ ওরা আসছে; জপের মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া বৃদ্ধের দল নিজেদের কানে কানে বলিত, চুপ চুপ ওরা আসছে, উত্তরে হাওয়া অবধি যেন সৌধমালার কানে কানে বলিয়া যাইত, চুপ, চুপ, ওরা আসছে। ওরা কারা কেহ শুধাইলে মৈত্রীবাহিনী সংক্ষেপে বলিত, উজ্জয়িনীর শত্রু; আবার শুধাইলে আরও সংক্ষেপে বলিত—মৌখরি।

সিন্ধুনদগর্ভে সেই দ্বীপ, সেই দ্বীপে সেই গিরিশঙ্কু, সেই গিরিশঙ্কুপৃষ্ঠে সেই মনুষ্যমূর্তি। সেই মূর্তি অস্তমান সূর্যবিম্বের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। মূর্তি স্থাণু, সূর্যবিম্ব অপস্রিয়মান। রুক্ষ দগ্ধ অনুর্বর গিরিদিগন্তের পিছনে ধীরে ধীরে সূর্যফলক নামিয়া যাইতেছে, গিরিমালা রক্তাভ, তৃষাশুষ্ক প্রান্তর ধূসর, পশ্চিম দিগন্ত কমলা, হলুদ, বেগুনী রঙের ত্রিবলীচিহ্নিত। মনুষ্যমূর্তি দেখিতেছে, সূর্যচক্র ক্রমেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে, নদীর নীল দর্পণে নীড়গামী পাখি চকিতে ছায়া নিক্ষেপ করিতেছে, কোন্ বন্ধুরতার অন্তরাল হইতে নিস্তব্ধতার চুড়ির টুং টাং ধ্বনির মত সার্থবাহী উষ্ট্রসারির গলবদ্ধ ঘণ্টার মৃদু করুণ শব্দ

উঠিতেছে, ছায়া বিস্তৃততর, অন্ধকার গাঢ়তর, নৈঃশব্দ্য গভীরতর হইতেছে ; অবশেষে এক সময়ে অস্তমান সূর্যের শেষ বিন্দুটি মিলাইয়া গেল, মনুষ্যমূর্তি নড়িল না, সরিল না, স্থান পরিবর্তন করিল না।

মনুষ্যমূর্তি আপন মনে মগ্ন হইয়া ভাবিতেছে—আজ কতদিন হইল? কতগুলি ঋতু গেল? কতদিন, কত ঋতু সে এখানে আসিয়াছে? জনপদ হইতে দূরে থাকায় মাস, সপ্তাহ, বর্ষগণনার সংস্কার তাহার মন হইতে স্খলিত হইয়াছিল, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের দ্বারা চিহ্নিত দিবারাত্রিই তাহার একমাত্র গণনীয় ; বর্ষণ, পুষ্পসম্ভার, শীতাতপের আধিক্য দ্বারা পরিজ্ঞাত ঋতুচক্রের আবর্তনই তাহার আর-এক গণনীয়। যে বর্ষগণনার দ্বারা মানুষ ইতিহাসের পরিমাপ করে, সে বোধ তাহার লুপ্ত। তবু শুধু সংস্কারবশত একএকবার ভাবিতে চেষ্টা করে, না জানি এখন উজ্জয়িনীর সিংহাসনে কোন্ গুপ্ত মহারাজ অধিরূঢ়। মহারাজ বুধগুপ্তের জীবনাবসান ঘটিয়াছে কি? তাঁহার পরে কে সিংহাসন লাভ করিবেন? পুরগুপ্তের সিংহাসনে বসিবার কথা কিন্তু অরাজকতার গোধূলিতে কে বসিবে স্থির নাই, বল যার সাম্রাজ্য তার! বল যার! শ্বেতহূনগণকে বাধা দিবার মত বল কাহার? আর এতদিনে তাহার বন্ধুদের, কালিদাস, নিচুল, শীলবতীর কী হইল কে জানে। সকলেই তো বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। অমনি তাহার মনে পড়ে, সে নিজেও

তো বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। লোকালয়ে থাকে না, সব সময়ে বয়সের কথা মনে পড়ে না, তাই বলিয়া বয়স তো বসিয়া নাই, সে-ও তো বৃদ্ধ হইয়াছে। তখনি ভাবে, মহাকাল তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন কেন? আর এখানে এইভাবেই বা রাখিলেন কেন? সমগ্র আর্যাবর্তের প্রহরী করিয়া জাগ্রত রাখিলেন কেন? কী তাঁহার অভিপ্রায়।

অভিপ্রায়! মহাকাল যাহাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছেন সংসারচ্যুত করিয়া ছাড়িয়াছেন তাহার প্রতি অন্য অভিপ্রায় আর কি থাকিতে পারে? তখনই সে নিজমনের গুপ্ত ইচ্ছার প্রতিবাদ করিয়া উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া ওঠে, আমি সন্ন্যাসী, আমি সংসারত্যাগী, আমি সেনাপতি নই, আমি গৃহস্থ নই! সংসারের যাহা খুশি ঘটুক আমার কি? আমি কে?

প্রস্তরগাত্রে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সে বলিতে থাকে, মহাকাল, মহাকাল, আমাকে দয়া করো, আমি দুর্বল।

আবার বলিতে থাকে মহাকাল, আমার মন হইতে সন্ন্যাসীর অনুপযুক্ত চিন্তা দূর করিয়া দাও, মোহপাশ ছিন্ন করো।

সে বলে, সবচেয়ে দুস্ত্যাজ্য মোহ পরোপকারের সঙ্কল্প, আর্তত্রাণের ইচ্ছা। সেই শেষ মোহপাশ আমার ছিন্ন করিয়া দাও, আমি দুর্বল, আমি অক্ষম, আমি অশক্ত! আমাকে রক্ষা করো—বলিতে বলিতে সে গুহার মধ্যে

ছুটিয়া চলিয়া যায়। এমন কতবার গিয়াছে। গিয়া পাষাণভিত্তিতে লুটাইয়া পড়ে। এমন কতবার পড়িয়াছে।

অন্ধকার নির্জন গুহামধ্যে সারারাত্রি ধরিয়া তাহার আর্ত মুক্তিপ্রার্থনা আর বাদুড়ের পাখার ঝটপটানি ধ্বনিত হইতে থাকে।

প্রচণ্ড ঝড়ের তাড়নে সমুদ্র উদ্বেল ; তটের শাসন লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত সমুদ্রটাই যেন নগরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, কি মহাবজ্রনির্ঘোষ! নগরী সুপ্ত, জাগ্রত একা পুষ্যভূতি ; তিনি দেখিলেন যে নগর বাঁচাইবার উপায় নাই, তখন তিনি পালাইতে শুরু করিলেন। এমন সময়ে ত্রিশূলধারী এক মহাপুরুষ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

কোথায় যাও?

সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে, পথ ছাড়ুন।

নিজ প্রাণ বাঁচাইবার এমন আকিঞ্চন? মূঢ়, নগর রক্ষা করো।

আমি একা কি করিব?

তুমি একাই সহস্র!

সমুদ্র সহস্রশীর্ষ, সহস্রবাহু, সহস্রায়ুধ, সহস্রকণ্ঠ, আমি ভীত।

আমার ত্রিশূলকে ভয় নাই?

আপনি আমাকে প্রাণে মারিবেন কেন?

তুমি নগরকে রক্ষা করিবে না কেন?

নগরী যে সুপ্ত।

তাহাকে জাগরিত করো। যাও, ফিরিয়া যাও।

তারপরে কি হইল ভালো মনে নাই, পুষ্যভূতির কেবল একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে; তিনি যেন একবার নগরগ্রাসী একটা তরঙ্গশীর্ষে উঠিলেন, আবার অতলস্পর্শী অন্ধকারে পড়িলেন। তারপরে সমস্ত নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ....

দুঃস্বপ্ন! বলিয়া পুষ্যভূতি ব্যাঘ্রচর্মের উপরে উঠিয়া বসিলেন, আবার ভাবিলেন, কী দুঃস্বপ্ন। তিনি ভাবিলেন, হঠাৎ কেন এই স্বপ্ন, কোথায় সেই নগরী, কে সেই মহাপুরুষ? তাঁহার মনে হইল, স্বপ্ন, অথচ কিরূপ স্পষ্ট! এখনও সমুদ্রের সেই হলহলা কানে বাজিতেছে।

দুঃস্বপ্ন কাটাইবার আশায় তিনি গুহা হইতে বাহিরে আসিলেন। কী আশ্চর্য, তবু সেই মহা হলহলা কানে বাজিতেছে! এমন সময়ে নদীর পশ্চিম দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, এ কি! বিস্ময়ে, ভয়ে পুষ্যভূতি জড়বৎ হইয়া গেলেন, সে-দৃশ্য হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখ কেবলি বলিতে লাগিল, এ কি! এ কি! এ কি!

বিস্ময় যতই কমিল, ভয় ততই বাড়িল, তখন 'এ কি—এ কি' ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, এ কারা? এ কারা?

ক্রমে ভয় ও বিস্ময় অন্তর্হিত হইয়া প্রত্যয় ও জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন, তবে কি তারাই,

তবে কি তারাই? নিশ্চয়, নিশ্চয়, আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুষ্যভূতি উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, শ্বেতহূন! আর্যাবর্তের দ্বারে শ্বেতহূন!

নিজেকে জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে বারংবার সবেগে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিলেন, শ্বেতহূন, শ্বেতহূন, আর্যাবর্তের দ্বারে শ্বেতহূন।

মুহূর্তমধ্যে তাঁহার সন্ন্যাসীর ছদ্মচীর খসিয়া পড়িল, বাহির হইয়া পড়িল সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্রবর্ম। সন্ন্যাসী পুষ্যভূতি অভাবিতের সংঘাতে সেনাধ্যক্ষ মহাদণ্ডনায়কে রূপান্তরিত হইলেন। সৈনিকের অভিজ্ঞ দৃষ্টি বুঝিল, শ্বেতহূন-বাহিনীর দৃশ্যমান অংশটুকুর সংখ্যাই লক্ষাধিক হইবে, সমস্ত দিগন্ত ব্যাপিয়া তাহাদের অবস্থান। তিনি জানিতেন, শ্বেতহূনগণ কেবল সৈন্যবাহিনী আনয়ন করে না, পুত্র-কন্যা-কলত্র, সমস্ত সংসার, সমস্ত পত্তন বহন করিয়া আনে। ইহারা কেবল জয় করিতে আসে না, বিজিত দেশে বসবাস করিতে আসিয়া থাকে। তিনি আরও বুঝিলেন যে, এই দৃশ্যমান অংশটুকু সমগ্র বাহিনীর সামান্য অংশমাত্র, পশ্চাতে আরো আছে, যে-পশ্চাৎ এখনও দৃষ্টি-সীমার অনায়ত্ত।

পুষ্যভূতি দেখিতে পাইলেন, সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে, ক্রোশমাত্র ব্যবধানে তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। গুপ্ত সৈন্যবাহিনীর মত শিবির বস্ত্রের নয়, চর্মের। সে

শিবিরের সংখ্যাও আবার অল্প, অধিকাংশই খোলা মাঠে। মরুভূমির নিষ্কলুষ আবহাওয়ায় সমস্ত দৃশ্য তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ছোট ছোট ঘোড়ায় চড়িয়া তাহারা ছুটাছুটি করিতেছে। কতক বসিয়া, কতক শুইয়া, কতক জটলা পাকাইয়া অবস্থান করিতেছে। স্থানে স্থানে ধূম ও অগ্নি। যাহারা নদের খুব কাছে তাহাদের গাত্রে চর্মাবরণ, হস্তে তীরধনুক দৃশ্যমান। তিনি বুঝিলেন, হলহলা সমুদ্রের নয়, এই অরাতিচমূর, বোধ করি সমুদ্রের হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

পুষ্যভূতি মনে মনে বুঝিলেন, আর্যাবর্তের, গুপ্তসাম্রাজ্যের এই সেই বহুশঙ্কিত মুহূর্ত। ইহাদের উদ্দেশ্য ও চরমলক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্তধারণা ছিল না। তিনি বাল্যকাল হইতে সৈন্য চলাচল দেখিতেছেন, কাজেই অল্পেই বুঝিতে পারিলেন যে উজ্জয়িনী পৌঁছিতে ইহাদের অন্তত তিন মাস লাগিবে, কিছু বেশিও লাগিতে পারে, পথের অন্যান্য নগর ধ্বংস না করিয়া ইহারা আগাইবে না। তিনি বুঝিলেন, পথের বড় বড় নগর যদি ইহাদের অগ্রগতিকে বাধা দেয়, তবে আরও কিছু সময় পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে উজ্জয়িনীকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। গুপ্তসাম্রাজ্য রক্ষা পাইলে আর্যাবর্ত রক্ষা পাইবে, গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে কে রক্ষা পাইবে? ইতিকর্তব্য স্থির করিতে তাঁহার মুহূর্তকালও বিলম্ব হইল না। গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সুরক্ষিত অস্ত্রশস্ত্রে বর্মচর্মে বীরবেশ ধারণ করিলেন। তারপরে

মহাকালের উদ্দেশ্যে মনে মনে বলিলেন, প্রভু, আমি অভিমানভরে সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলাম, চরম মুহূর্তে তুমি প্রমাণ করিয়া দিলে সন্ন্যাস আমার নয়, আমি সৈনিক। প্রভু তোমার কাছে সন্ন্যাসী ও সৈনিকের সমান মূল্য, তুমিই বুঝাইয়া দিলে স্বধর্মই যথার্থ ধর্ম! এই অশক্ত দেহে তুমিই সেই স্বধর্মের ক্ষেত্রে আমাকে প্রেরণ করিতেছ! জয় হোক বা পরাজয় হোক, স্বধর্মপালনে যেন পরাঙ্মুখ করিও না।

মহাকালের উদ্দেশ্যে প্রণতি সারিয়া তিনি গুহার বাহির হইলেন। এতক্ষণে তাঁহার কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত অর্থময় হইয়া উঠিল।

সেই গিরিশঙ্কু হইতে নামিবার সময়ে তাঁহার মনে পড়িল, কালিদাসপ্রদত্ত সেই অভিধা 'সিন্ধুনদের প্রহরী'; তিনি এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলেন, আর্যাবর্তের প্রহরী করিয়া স্বয়ং মহাকালই তাঁহাকে সিন্ধুনদতীরে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সমতলে নামিয়া আসিয়া দ্রুতপদে তিনি তক্ষশীলার দিকে চলিলেন।

•

তক্ষশীলায় পৌঁছিয়া পুষ্যভূতি দশ সুবর্ণমুদ্রায় একটি অশ্ব কিনিলেন। উজ্জয়িনী ত্যাগের সময়ে যে অর্থ তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, এ তাহারই অবশেষ। তারপরে অশ্বারূঢ় হইয়া তিনি তক্ষশীলা রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। যথাযোগ্য অভিবাদন সারিয়া জানাইলেন, যে, শ্বেতহূনগণ

সিন্ধুতীরে সমাগত, অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। পারিষদ-বেষ্টিত রাজা বলিলেন যে, তিনি এ সংবাদ অবগত আছেন, কিন্তু উহারা সৈনিক নয়, বেদে মাত্র। তা ছাড়া তিনি বাহ্লীকরাজ তোড়মানের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ, কাজেই শত্রু-আক্রমণের ভয় তাঁহার নাই। পুষ্যভূতি অনেক প্রকারে তাঁহাকে সম্বোধিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু রাজা কর্ণপাত করিলেন না, পারিষদগণ রাজমতের পরিপোষক। অগত্যা বিফলকাম পুষ্যভূতি চন্দ্রভাগা পার হইয়া গিরিসানুসমীপবর্তী শাকলনগরে পৌঁছিলেন। শাকলনগরে সেদিন জাতীয় নৃত্যোৎসব। আবালবৃদ্ধ সকলেই আনন্দে মগ্ন। তক্ষশীলারাজ তবু তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, শাকলরাজের সে সময়টুকুও হইল না, উৎসব-সাজে সজ্জিত পুরবাসীগণ যোদ্ধৃবেশী বৃদ্ধের দিকে একবারমাত্র তাকাইয়া উৎসবক্ষেত্রের দিকে প্রস্থান করিল। তারপর পুষ্যভূতি শতদ্রু পার হইয়া জালনধর নগরে পৌঁছিলেন। জালনধর হইতে স্থানেশ্বরে, স্থানেশ্বর হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে। কিন্তু সর্বত্র তিনি ব্যর্থ হইলেন। কোন নগরের রাজা বৃদ্ধের কথা শুনিলেন, কোন নগরের রাজা বা তাহাও শুনিলেন না। ফল সর্বত্রই এক; সকলেই বাহ্লীকরাজের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে বলশালী, কাজেই শত্রুর আগমন অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, বৃদ্ধের বিকৃতকল্পনাপ্রসূত। পুষ্যভূতিকে কেহ বা বুড্ঢা বলিল, কেহ বা বাউরা বলিল, কেহ বা লড়াইক্ষেপা

বলিল। কেহই তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল না, বিচলিত হইল না। তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যমুনা পার হইয়া দক্ষিণদিকে চলিতে শুরু করিলেন।

এতদিনে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল উজ্জয়িনীকে নয়, সমস্ত আর্যাবর্তকে এক মোহাবরণে আচ্ছন্ন করিয়াছে; জগতে যে কোথাও শত্রুর আশঙ্কা আছে, তাহাতে অবিশ্বাসই এই মোহের স্বরূপ। তাঁহার মনে হইল, মজ্জমান ব্যক্তি তৃণখণ্ড আশ্রয় করে, ধ্বংসপ্রবণ জাতি ছদ্মশত্রুর মৈত্রী-সঙ্কেতকে অবলম্বন করিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছে; তিনি বুঝিলেন, বিধাতা প্রাণে মারিবার আগে বুদ্ধিনাশ করিয়া থাকেন।

আরাবল্লী গিরিমালা পশ্চিমে রহিল, সম্মুখে বিরল জনপদ, তৃষ্ণার তাম্রশাসনের ন্যায় শুষ্ক রুক্ষ বন্ধুর মরুভূমি। দিবসে প্রখর তাপ, রাত্রে প্রখর শীত, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া একক অশ্বারোহী দিবারাত্রি দক্ষিণদিকগামী। নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে অশ্ব বাঁধিয়া কয়েক দণ্ড তিনি ঘুমাইয়া লন; নিতান্ত ক্ষুধিত হইলে কোন ভীলপল্লীতে ভুট্টামুষ্টি সংগ্রহ করিয়া আহার করেন, অশ্বকে তৃণমুষ্টি বা বৃক্ষপল্লব দান করেন, নিতান্ত তৃষিত হইলে ফল্গুধারা হইতে জল সংগ্রহ করিয়া স্নানপান করেন, অশ্বকে স্নানপান করান। তাছাড়া কেবলি সোজা দক্ষিণ দিকে তাঁহার গতি,—দক্ষিণে, আরও, আরও দক্ষিণে। পথে ছোট বড় কত নগর পড়িল,

সিংহপুর, ময়ূরপুর, দশপুর, নলপুর, বিদিশা। সমস্ত নগরের অধিবাসীই পরম বিশ্বস্ত, পরম নির্ভয়। কেহই পুষ্যভূতির বাক্যে বিশ্বাস করিল না ; কোন কোন নগরের অতি উৎসাহী রাজা তো তাঁহাকে বন্দী করিবার ভয় দেখাইলেন, মিত্র-রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি নাকি অবিশ্বাস সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় আছেন।

অতএব অশ্বপৃষ্ঠে কশাপ্রয়োগ করিয়া তিনি দক্ষিণে ছুটিতে থাকেন। ইতিমধ্যে পশ্চাদাগত পথিকের মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, শ্বেতহূনগণ তক্ষশীলা ও শাকল ধ্বংস করিয়াছে। এ সংবাদ একা তিনি ছাড়া আর কেহ বিশ্বাস করিল না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, অন্তত উজ্জয়িনী পুরাতন মহাদণ্ডনায়কের বাক্যে বিশ্বাস করিবে। নৈরাশ্যে মানুষ বাঁচিতে পারে না, কাজেই নিতান্ত অসম্ভব স্থলেও তাহাকে আশার কুহক সৃষ্টি করিতে হয়।

অবশেষে একদিন বিকাল বেলায় অতি দূর দক্ষিণে দিগন্তের সঙ্গে মিশিয়া মসীলেখার ন্যায় গিরিলেখা জাগিল—বিন্ধ্য পর্বতমালা, তাহারই কোলে নগরীশ্রেষ্ঠ উজ্জয়িনী, পুষ্যভূতির লক্ষ্য। তিনি বুঝিলেন তাঁহার যাত্রা শেষ হইয়া আসিল।

পরদিন দিবসের প্রথম প্রহরে পুষ্যভূতি উজ্জয়িনীর সিংহদ্বারে পৌছিলেন। তখনও সমুদ্রগুপ্তের সেই রণ-দামামা সিংহদ্বারে সংলগ্ন ছিল। তিনি সেই রণদামামায় আঘাত

করিলেন। বিস্মৃত ইতিহাসের গভীর কন্দর হইতে বহুযুদ্ধজয়ের স্মৃতি বহিয়া দামামা গম্‌গম্‌ হুঙ্কার করিয়া উঠিল। নগরের অধিবাসিগণ সে হুঙ্কার এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল, হঠাৎ সেই ভৈরব আস্ফোট শুনিয়া তাহারা উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

দামামার রব শুনিয়া একে একে দু'য়ে দু'য়ে নাগরিকগণ সিংহদ্বারের কাছে জুটিতে লাগিল, কেহ বা কৌতূহলে, কেহ বা বিস্ময়ে, কেহ বা আগ্রহে, আবার কেহ বা শুধুই অপরে আসিতেছে দেখিয়া বা অন্য কাজ নাই বলিয়া। সিংহদ্বারের কাছে একটি জনতা জমিয়া উঠিলে অশ্বারূঢ় পুষ্যভূতি তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নাগরিকগণ, আমি তোমাদের পুরাতন মহাদণ্ডনায়ক পুষ্যভূতি, আমি অনেকবার তোমাদের রণজয়ের সংবাদ দিয়াছি, অনেক সময়ে মহারাজ কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের জয়বার্তার আমিই ছিলাম প্রথম ঘোষক। আজও আমি প্রথম ঘোষক, কিন্তু রণজয়ের নয়, শত্রু-আবির্ভাবের, অচির আশঙ্কার। নাগরিকগণ, সময় মতো শত্রু-আবির্ভাবের সংবাদদান রণজয়ের মতোই সুসংবাদ। তোমরা সকলে প্রস্তুত হও।

পুষ্যভূতির সংবাদে নাগরিকগণ বিস্মিত হইল। তাহারা এত কাল শুনিয়া আসিতেছিল, বা তাহাদের শোনানো হইতেছিল যে পুষ্যভূতি বিশ্বাসঘাতক, সে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র-শক্তি মৌখরিগণের পক্ষে যোগদান করিয়াছে। এখন

সেই পুষ্যভূতির আবির্ভাব, তাহার মুখে শত্রু আবির্ভাবের বার্তা, নাগরিকগণের বিস্ময়কে আরও বাড়াইল।

দু'একজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—ভাই এ কেমন হ'ল! মহাদণ্ডনায়ক যদি বিশ্বাসঘাতক হবেন, তবে এ সংবাদ দিচ্ছেন কেন?

একজন বলিল—ওদের কথা বিশ্বাস করো কেন! মহাদণ্ডনায়কের চরিত্রে কালি মাখাবার জন্যই ওসব বলেছে। তাহার বাক্য শেষ হইবার আগেই অপর বলিল, আরে চুপ, চুপ, কে কোথা থেকে শুনবে, সবাই বিপদে পড়বো।

আবার দু'চার জনে যাহারা মহাদণ্ডনায়কের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল—কি জানি ভাই, এতদিন পরে ওঁর এখানে আস-বার অর্থ কি! হয়তো শত্রুপক্ষের অভিসন্ধিতেই এখানে এসেছেন, আর আমাদের বিপদে ফেলবার জন্যই ওসব বলছেন।

জনতার সঙ্কল্পের অভাব দেখিয়া মহাদণ্ডনায়ক আবার আরম্ভ করিলেন—নাগরিকগণ, তোমাদের অনেকেই মহারাজ কুমারগুপ্ত, মহারাজ স্কন্দগুপ্তের সৈন্যদলে ছিলে; তোমাদেব অনেকেই তাদের ধ্বজপতাকাকে দিগ্‌দিগন্তে শত্রুরাজ্যে প্রোথিত করেছ, তোমাদের অনেকেই মহারাজের ধনুকশ্চ্যুত শরের মতো শত্রুবক্ষ বিদীর্ণ করেছ, তোমাদের অনেকেই আমার আদেশে নিশ্চিত মৃত্যুর মতো শত্রুব্যূহের উপরে

পতিত হ'য়েছ। সেই তোমরা, সেই আমি, তবে আজ এমন অসঙ্কল্প কেন?

একজন শুধাইল, শত্রু কে?

শ্বেতহূন।

অনেকগুলি বিস্মিত কণ্ঠে শব্দ উঠিল, শ্বেতহূন? তারা—তারা যে আমাদের মিত্র!

তোমাদের শত্রু যদি কেউ থাকে, গুপ্তসাম্রাজ্যের শত্রু যদি কেউ থাকে, সমগ্র আর্যাবর্তের শত্রু যদি কেউ থাকে তবে সে শ্বেতহূন।

আপনি কোথায় এ সংবাদ পেলেন?

সংবাদ নয়, স্বচক্ষে দৃষ্ট। শ্বেতহূন বাহিনীকে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে স্বচক্ষে দেখেছি, একজন নয় দু'জন নয়, সিন্ধুনদের বালুকা রাশির মতোই অসংখ্য অগণ্য।

তারা যদি এত দূরে তবে এখনই দুশ্চিন্তা কেন?

দুশ্চিন্তা কেন নয়? আর্যাবর্তের সীমান্ত যে সিন্ধুনদ। গৃহের সীমান্তে শত্রুর আবির্ভাব কি গৃহমধ্যে শত্রুর আবির্ভাব নয়?

বহু দিনের আরামে উজ্জয়িনীর জীবনতন্ত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাই একজন বলিল—আপনি বৃথা দুশ্চিন্তা করছেন। মাঝপথে অনেক বীরনগরী আছে তারা প্রতিরোধ করবে।

প্রতিরোধ! তক্ষশীলা ও শাকল বিধ্বস্ত হয়েছে, শত্রু

পার্বত্য বন্যার মতো অগ্রসর হচ্ছে, এতদিনে স্থানেশ্বর ও ইন্দ্রপ্রস্থ ধ্বংস করে নিশ্চয় তারা যমুনা অতিক্রম করেছে।

আরামপ্রিয়তা অপ্রিয় সম্ভাবনা এড়াইবার বিচিত্র উপায় সন্ধান করে। অপর একজন বলিল, সম্মুখে দুস্তর মরুভূমি, শত্রু বাধা পাবে।

বন্যাপ্রবাহে মরুভূমি ভেসে যাবে। আর একমুহূর্ত্ত কালব্যাজ উচিত নয়, তোমরা প্রস্তুত হও।

ইতিমধ্যে একদল সৈনিক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা প্রাচীন পরিচিত সমরনায়ককে দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল—তাই বলো, আমাদের সেনাপতি কি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন?

অন্য একজন সৈনিক বলিল—বেটারা এতদিন সব মিছে কথা শুনিয়েছে।

তৃতীয় একজন বলিল, এতদিনে সব বোঝা গেল। উনি শত্রুর সংবাদ আনবার জন্যই রাজধানী পরিত্যাগ করেছিলেন, আর বেটারা বলে কিনা উনি যোগ দিয়েছেন মৌখরিদের সঙ্গে।

তখন সৈনিকগণ সমস্বরে গর্জিয়া উঠিল—জয় মহাদণ্ডনায়কের জয়! জয় মহারাজ বুধগুপ্তের জয়।

সৈন্যদলের উৎসাহে আবিষ্ট হইয়া জনতাও তাহাদের সঙ্গে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিল। মহাদণ্ডনায়ক আশ্বস্ত হইলেন, উজ্জয়িনীর অবস্থা এখনো চিকিৎসার অতীত নয়।

এমন সময়ে নূতন মহাদণ্ডনায়ক নরপাল অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত। সে সংবাদ পাইয়াছিল যে সিংহদ্বারের কাছে কি একটা গোলযোগ চলিতেছে। নরপাল যাই হোক নির্বোধ নয়, পুষ্যভূতিকে দেখিয়া, জনতা ও সৈনিকের উদ্দীপনা দেখিয়া একমুহূর্তে সে বুঝিয়া লইল কি ঘটিতে চলিয়াছে। তখন ঘটনাস্রোতের গতি ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে নরপাল বলিল—সৈন্যগণ, তোমরা জানো যে ঐ লোকটা বিশ্বাসঘাতক, এখনি ওকে নিহত করো।

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল—কিন্তু ওঁর কথা তো বিশ্বাসঘাতকের মতো নয়।

নরপাল বলিল—বিশ্বাসঘাতককে বোঝা কি এতই সহজ! এখনি ওকে বধ করো।

পুষ্যভূতি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—নরপাল, মৃত্যুর ভয় কা'কে দেখাও! আমি সহস্র বার রণক্ষেত্রে করাল মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছি—এই সৈনিকগণ তার সাক্ষী।

কেহ কেহ বলিল—একথা ঠিক।

আর তুমি নরপাল কত বার মৃত্যুর কাছে গিয়েছ রোগের আশঙ্কা ছাড়া?

জনতার মধ্য হইতে একজন ধিক্কারের সুরে বলিল—আর জুয়োর আড্ডায় মাতলামি ছাড়া।

অপর একজন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—আর শ্বেতহূনিকাদের আঁচড়কামড় ছাড়া।

অনেকে হাসিয়া উঠিল।

নরপাল দেখিল ঘটনাস্রোত তাহাকে বিপর্যস্ত করিবার উপক্রম। তাই সরাসরি সে পুষ্যভূতিকে আক্রমণ করিল, বিশ্বাসঘাতক, তুমি মৌখরিগণের চর।

পুষ্যভূতি বলিল, ও কথা তোমার প্রভু শ্বেতহূনগণের রচনা।

সাবধান, আমার প্রভু মহারাজ বুধগুপ্ত।

তাই হওয়া উচিত বটে। কিন্তু তুমি শুধু পাষণ্ড নও, তুমি কৃতঘ্নও। নিশ্চিন্ত মহারাজকে ছলনা ক'রে নগরমধ্যে তুমি শত্রুপোষণ করছ।

নরপাল বলিল—কে শত্রু?

পুষ্যভূতিকে উত্তর দিতে হইল না, জনতার একাংশ বলিয়া উঠিল, শ্বেতহূন! যাদের অত্যাচারে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ, পুরাণকথা কীর্তন বন্ধ, দশজনে একত্র মিশে নাচগান আনন্দ করা বন্ধ, এমন কি সহজে স্বেচ্ছায় পথে ঘাটে চলা অবধি বন্ধ! শত্রু তারাই, সেই শ্বেতহূনের দল।

আর একটি দল বলিয়া উঠিল, আজ তারাই আসছে অগণ্য সংখ্যায়, মহাদণ্ডনায়ক এনেছেন সেই সংবাদ।

জনতা সমস্বরে ছাড়া কথা বলে না। জনতার সমর্থন পাইয়া পুষ্যভূতি বলিয়া উঠিলেন—এবারে তোমরা বিচার করো বিশ্বাসঘাতক কে! মহাদণ্ডনায়ক কে! কার বাক্য তোমরা বিশ্বাস করবে! কার আদেশ তোমরা পালন করবে!

সকলে সমস্বরে গর্জিয়া উঠিল, বিশ্বাসঘাতক নরপাল! মহাদণ্ডনায়ক পুষ্যভূতি।

নরপাল বুঝিল জনতা তাহার আয়ত্তের অতীত, সৈনিক দলও তাহার আয়ত্তের মধ্যে নয়; আরও বুঝিল, এই ভাবে আর কিছুক্ষণ চলিলে তাহার প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে; সে স্থির করিল, এখন ফিরিয়া যাওয়া যাক্, পরের কর্তব্য পরে স্থির করিবে। নগরে প্রবেশের উদ্দেশ্যে যখন সে ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়াছে—তখন মুহূর্তমধ্যে এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

পুষ্যভূতি ঊর্ধ্বোত্থিত দক্ষিণ হস্তে তরবারি ধরিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে নগর-প্রাকারের উপর হইতে একটি নিক্ষিপ্ত শর তাঁহার দেহের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া আমূল নিহিত হইল, পুষ্যভূতি একবার বামে টলিলেন, একবার দক্ষিণে টলিলেন, তারপরে তাঁহার প্রাণহীন দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। জনতা বিস্ময়ে 'হায় হায়, কি হইল, কি হইল, কে করিল, কে করিল' শব্দ করিয়া উঠিল। নরপালও কম বিস্মিত হয় নাই; কিন্তু নিজের অপ্রিয় ও অসাধ্য কর্ম অপরে সাধন করিবার আনন্দচিহ্ন তাহার চাপা হাসিতে ফুটিয়া উঠিল, নরপাল নগরের দিকে প্রস্থান করিল। বিস্মিত, ভীত, নেতৃ-বিহীন জনতাও ধীরে ধীরে অপসারিত হইল। মৃত-দেহ সেখানে সেই অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল।

পুষ্যভূতির সঙ্গে নরপালের যখন বিতণ্ডা চলিতেছিল, তখন নগরপ্রাকারের উপরে, একটি বৃক্ষের পত্রপল্লবের আড়ালে বসিয়া দুই ব্যক্তি সমস্ত দেখিতেছিল। একজন ভারতীয়, অপর জন বিদেশী, তাহার রঙ ফর্সা, চোখ কটা, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফহীন। ভারতীয়ের হস্তে ধনুঃশর, বিদেশীর হস্তে একটি শ্বেতকহ্লার।

ভারতীয় বলিল, এবার শর নিক্ষেপ করি। বিদেশী বলিল, এখনো সময় হয় নি। দেখা যাক্ জনতা কি করে।

ভারতীয় বলিল, জনতা যে নরপালের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্ছে।

তাই তো দেখছি, কি ভাবে জনতাকে উত্তেজিত করতে হয় নরপাল তা জানেন না।

ঐ দেখুন, এবারে জনতা বোধ করি নরপালকে আক্রমণ করবে।

আমাদের দেশে এ সব কাজ বেশ গোপনে করা হয়, জনতার মনোহরণ কার্যে আমাদের তুলনা নেই।

দেখুন, দেখুন, ক্ষিপ্ত জনতার মতিগতি ভালো নয়, এবারে শর নিক্ষেপ করি।

বিদেশী বলিল, তবে তাই হোক।

ভারতীয় শর নিক্ষেপ করিল।

তারপরের ঘটনা আগে বর্ণনা করা হইয়াছে।

জনতা অপসারিত হইলে বিদেশী ভারতীয়ের উষ্ণীষে শ্বেত-কহ্লারটি গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আপনি আজ আততায়ীর হাত থেকে নগর রক্ষা করলেন, আপনি যথার্থই দেশসেবক।

ভারতীয় অকুণ্ঠিত মনে প্রশংসাটুকু আত্মসাৎ করিল।

তারপর দুইজনে যেমন গোপনে আসিয়াছিল, তেমনি গোপনে প্রাকার বাহিয়া প্রস্থান করিল।

মহারাজ বুধগুপ্তের সমীপে উপস্থিত হইয়া নরপাল বলিল, মহারাজ, একজন শত্রুচর নগরে প্রবেশের চেষ্টা করছিল, তাকে হত্যা করেছি।

বৃদ্ধ বুধগুপ্ত বলিলেন, উত্তম।

তারপর তিনি নরপালকে পুরস্কৃত করিলেন।

পুষ্যভূতির নামটা নরপাল চাপিয়া গেল।

তারপরে নরপালের আদেশে, মৈত্রীবাহিনী পুষ্যভূতির মৃতদেহ আনিয়া নগরচত্বরে ফেলিয়া রাখিল। শত্রুচরের সৎকার নিষিদ্ধ হইল।

তখন মৈত্রীবাহিনী বাদ্যসহযোগে নগর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘোষণা করিল যে রাষ্ট্রশত্রু মৌখরিগণের এক গুপ্তচর নগরমধ্যে প্রবেশের চেষ্টায় ছিল, ক্ষিপ্ত জনতা তাহাকে হত্যা করিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ সর্বত্র পুষ্যভূতির অশ্ব প্রদর্শিত হইল। অশ্ব মৌন, সকলে বুঝিল 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং।'

যাহারা প্রকৃত ব্যাপার জানিত, বা আততায়ীর স্বরূপ জানিত তাহারাও অশ্বের মতো মৌনতা অবলম্বন করিয়া রহিল, তাহারা দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিয়াছিল যে মৈত্রী-বাহিনীর বিরুদ্ধে মুখখোলা বিপজ্জনক ; ঘর পুড়িবে, গোরু চুরি হইবে, অন্ধকারে মার খাইতে হইবে, পুত্রের চাকুরি যাইবে, হয় তো বা শত্রুচর অপবাদে দেশান্তরী হইতে হইবে।

সারাদিন মৃতদেহ নগরচত্বরে পড়িয়া রহিল। কিন্তু সেই বীরমুখে এমন একটি শান্তি ও মহিমার ভাব সংলগ্ন ছিল যে শকুন, কুক্কুর প্রভৃতি মাংসাশী পশুপক্ষী কাছে ঘেঁষিতে সাহস করিল না, সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া দূরে দূরে রহিল।

অপরাহ্নের দিকে নিচুলের কানে সংবাদটি পৌঁছিল। কৌতূহলের বশে নগরচত্বরে পৌঁছিয়া মৃতদেহ দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, একি, এযে পুষ্যভূতির মৃতদেহ! নিচুলও বিজ্ঞতর হইয়াছিল, কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিল না, সোজা শীলবতীর কুটিরে গেল, জানিত সেখানে কালিদাসকে পাওয়া যাইবে।

নিচুল বলিল, কবি, অত্যন্ত দুঃসংবাদ।

কালিদাস আজ কাল সর্বদা দুঃসংবাদের জন্য প্রস্তুত থাকেন তবে ভীত নন, তাঁহার রঘুবংশ কাব্য, জীবনের শেষকৃত্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আবার কি দুঃসংবাদ?

পুষ্যভূতি নিহত।

শীলবতী ও কালিদাস চমকিয়া উঠিলেন।

পুষ্যভূতি নিহত! কি প্রলাপ!

নিচুল বলিল, প্রলাপ নয়।

শীলবতীর কুটিরে আসিবার সময়ে দু'একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে ঘটনার সবিশেষ বিবরণ নিচুল শুনিয়াছিল, এখন সে-সব বর্ণনা করিল।

সমস্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ তিনজন হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তারপরে কালিদাস বলিলেন, বৃদ্ধবয়সে সংবাদ মানেই দুঃসংবাদ।

শীলবতী চোখের জল মুছিলেন।

কালিদাস বলিলেন, পুষ্যভূতি আর্যাবর্তের প্রহরীর কাজ করেছেন, আর্যাবর্ত যদি এখন তার কর্তব্য না করে সে দোষ তাঁর নয়। তাঁর সদ্‌গতি হয়েছে। কিন্তু নিচুল, এখন তাঁর সৎকার করা আবশ্যক।

শত্রুচরের সৎকার নিষিদ্ধ।

কি বল্‌ছ?

যথার্থ বলছি।

আমি মহারাজের কাছে নিজে যাবো।

কোন ফল হবে মনে হয় না বরঞ্চ মৈত্রীবাহিনীর অধিনায়ককে অনুরোধ করলে বেশি ফল হবার সম্ভাবনা।

না, না, 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।'

অরপরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, অনেক কাল আগে লিখেছিলাম, তখন জানতাম না যে এই প্রসঙ্গে ব্যবহার হবে।

কালিদাস মহারাজের কাছে যাত্রা করিলেন।

মৈত্রীবাহিনী, শ্বেতহূন ও কল্কক কতক নগরপ্রধানের দ্বারা অবজ্ঞাত হইলেও মহারাজের কাছে তাঁহার মর্যাদা আগের মতোই ছিল।

তিনি কবিকে সমাদর করিয়া বলিলেন, আজ আমার সৌভাগ্য যে মহাকবির দর্শন পেলাম।

কালিদাস বলিলেন, সৌভাগ্য আপনার নয় মহারাজ আমার। তবে আজ কাল বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি কোথাও বড় যেতে ইচ্ছা করে না।

মহারাজ বুঝিয়াছিলেন যে কবির অসময়ে আসিবার বিশেষ হেতু আছে। শুধাইলেন, কি মনে করে!

মহারাজ বড়ই দুঃসংবাদ। পুষ্যভূতি নিহত হয়েছেন, তার মৃতদেহ নগরচত্বরে শায়িত।

পুষ্যভূতি নিহত! মহারাজ চমকিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, আমি তো জানি সে দেহ নিহত শত্রুচরের।

মহারাজকে ভুল জানানো হ'য়েছে। মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন, তবে পরে এক সময়ে আদ্যন্ত প্রকৃত ঘটনা বলবো, এখন বন্ধুর মৃতদেহ সংকারের অনুমতি প্রার্থনা করি।

অবশ্যই।

অনুমতি পাইয়া কালিদাস উঠিতেছিলেন, বুধগুপ্ত বলিলেন, মহাদণ্ডনায়কের পদমর্যাদার যোগ্য আয়োজন যেন হয়।

না, মহারাজ, তার প্রয়োজন নেই। আমরা যথাসম্ভব অনাড়ম্বর ভাবে কার্য সমাধা করবো।

'বেশ তাই হোক।

কালিদাস মহারাজকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গভীর রাত্রে শিপ্রাতীরে মহাকাল মন্দিরের ছায়ায় পুষ্যভূতির চিতাশয্যায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। পার্শ্বে দণ্ডায়মান কালিদাস, শীলবতী, নিচুল আর দুই চার জন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। লেলিহান শিখার দীপ্ত আলোকে শিপ্রার জলতল স্বর্ণময় হইল, ওপারের বাবলা বন উজ্জ্বল হইল, মহাকাল মন্দিরের ত্রিশূলচূড়া ভাস্বর হইল, আর কয়েকটি খিন্ন মুখমণ্ডল অশ্রুসুন্দর হইয়া প্রতিভাত হইল। ক্রমে চিতাগ্নি নিভিয়া আসিল, চারিদিক অন্ধকারে ডুবিল, মহাকাল মন্দিরের ত্রিশূল তমিস্রার মধ্যে অন্তর্যামীর অদৃশ্য তর্জনীর মতো ঊর্ধ্বোত্থিত হইয়া রহিল, আর আর্যাবর্তের আকাশ তারায় তারায় চোখের জলের ফোঁটায় ফোঁটায় ভরিয়া গেল।

শেষরাত্রে পুষ্যভূতির বন্ধুগণ শিপ্রাবারিতে চিতা প্রক্ষালিত করিয়া স্নানান্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

পরিশিষ্ট

গল্প শেষ হইলেও সংসার শেষ হয় না, তাহার চাকা ঘুরিতেই থাকে।

পুষ্যভূতির মৃত্যুর কয়েকদিন পরে রমানী ও বক্কনাস নিভৃতে বসিয়া কথা বলিতেছিল।

রমানী বলিল—আর তো মহারাজকে বিশ্বাস করা যায় না। পুষ্যভূতির সৎকার নিয়ে কি কাণ্ডই না ক'রে বসলেন।

বক্কনাস বলিল—বিশ্বাস যত কম লোককে করা যায় কার্যসিদ্ধির পথ ততই সুগম হয়।

তাই ব'লে যে লোকটা হাল ধরে ব'সে আছে সে যদি অবিশ্বাসী হয় তবে তো বিপদ।

হাল ধ'রে কে ব'সে আছে মনে করো? হাল ধ'রে ব'সে আছি তুমি আর আমি!

আবার আমাকে কেন! হাল ধরেছ তুমি। আর হালের উপরে যে ময়ূরপঙ্খীটি আঁকা থাকে আমি সেই ময়ূরপঙ্খী।

তারও তো প্রয়োজন আছে। ময়ূর দেখেই তো কত ময়ূর মুগ্ধ হ'য়ে এসে বসছে তোমার কাছে।

ঐ বসা পর্যন্তই।

কেন ?

এ যে আঁকা ময়ূরী।

সত্যি ?

তুমি কি মনে করো ?

যুবরাজ ?

তিনি মাঝে মাঝে ঠুকরে দেখেন বটে, তবে তখন এমন তূরীয় অবস্থা থাকে যে কাঠে ঠোকর মারলেন কি মানুষের দেহে ঠোকর মারলেন বুঝ্তে পারেন না।

রমানীর বর্ণনা-চাতুর্যে মুগ্ধ হইয়া বক্কনাস হাসিয়া উঠিয়া তাহার গাল ছুটি একবার টিপিয়া দিয়া বলিল—ধন্যি মেয়ে বাবা! কে জানতো যে তোমার মধ্যে এত আছে।

নাও, ছেনালী আরম্ভ হ'ল। ওসব এখন থাক্। মহারাজ যদি বিরোধিতা করতে থাকেন তবে আসল সময়ে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ!

মহারাজ বিরোধিতা করলেও বিপদ ঘটবে না।

কেমন ?

তাঁর হাত পা চোখ কান নাক মুখ সমস্তই অবশ।

ও! বুঝেছি। বলো যে পরবশ কিম্বা বলো আমার বশ।

যা খুশি বলো ব্যাপারটা তাই। আর শুধু হাত পা চোখ কান নয়, হৃদয়টি পর্যন্ত।

যুবরাজের কথা বল্ছো তো ?

হাঁ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এরা সবাই মৈত্রীরসে ডগমগ।

বাস্তবিক, গোটা কয়েক শব্দের তোড়ে যে বিশ্বজয় করা সম্ভব তা আগে কে জানতো?

এ কথা তোমার মুখে সাজে না। কথার মোহে কত জনের হৃদয় জয় করেছ সুন্দরী!

শুধু কথায় হয়নি বক্কনাস, সঙ্গে আমার সুবর্ণ ছিল।

এ কাজও শুধু কথায় হয়নি রমানী, সঙ্গে আমার সুবর্ণ ছিল। দেখো রমানী এদেশে কিছুকাল থেকে দেখলাম যে আদর্শের উপরে এদের বড় ভরসা। এরা মনে করে আদর্শ মহৎ হ'লেই সর্বার্থসাধক হয়। আমাদের ধারণা ভিন্ন। আদর্শ একটা আবশ্যক, কিন্তু সেটা হচ্ছে ঐ যে কিছুক্ষণ আগে বল্‌লে, হালের উপরে আঁকা ময়ূর! তারও একটা উপযোগিতা আছে, কিন্তু সে তো হালকে সচল ক'রে তুল্‌তে পারে না—তার জন্য চাই বাহুবল।

তবে তার মধ্যে আবার সুবর্ণ আসে কোথায়?

সুবর্ণ যে বাহুকে বলদান করে। এই সব কথা চিন্তা করেই তো রাজা তোমাকে আমাকে দু'জনকে পাঠিয়েছেন, আমি খুলবো সুবর্ণের থলি, তুমি খুলবে সুবর্ণের দানসত্র।

তাতে তো কার্পণ্য করি নি।

তা দেখেছি, বহু ভাগ্যবানকে তোমার প্রাসাদ থেকে মত্ত অবস্থায় বেরোতে।

সবচেয়ে বেশি মজেছে মহামাত্য। এদিকে ঘাটের মড়া, কিন্তু রসে টই-টুম্বর।

হবেই তো, ও যে এখন জীবন-পেয়ালায় শেষ চুমুক দিচ্ছে। এতটুকু রস তলায় পড়ে থাক্‌তে দেবে না।

আচ্ছা মহামাত্যের সেই ছুঁড়িটা কোথায় গেলো?

কে, মধুবল্লরী? সে তোমার প্রতাপে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে!

যাক্ আপদ গেছে।

আপদ যেমন যায়, তেমনি আবার আসে।

আবার কি এলো?

কোত্থেকে এক ছোকরা এসে নগরের কতকগুলো ছোকরাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

কি বল্‌ছে?

কিছু বলে না, সেই তো বিপদ্।

কেমন?

সবাই যখন উজ্জয়িনীবাহ্লীক মৈত্রীর সিংহনাদ করে, ওরা চুপ করে থাকে। শ্বেতকহ্লার হাতে দিতে গেলে হাত সরিয়ে নেয়।

কি আস্পর্ধা!

আরে আস্পর্ধা দেখায় না, সেই তো সঙ্কট! তারপরে শোনো, আরো আছে। নগরের প্রাচীর-গাত্রে আজ কাল প্রায়ই দেখা যায় যে বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে, 'শ্বেতহূন

না শ্বেতহস্তী।' 'শ্বেতহূন নিপাত যাক্।' আর দুঃখের কথা কি বলবো রমানী, একদিন একটি চিত্র দেখা গেল, একটি ক্ষুদ্র মনুষ্য মূর্ত্তির বিরাট বক্র এক নাসিকা, নীচে লিখিত 'বক্রনাসা সর্ব্বনাশা।'

যুবরাজকে ব'লে দণ্ডের ব্যবস্থা করলে না কেন?

অপরাধী কোথায়?

ঐ ছোকরার দলই নিশ্চয়।

সে তো তোমার অনুমান মাত্র।

বেশ, তোমার অনুমান কি বলে?

ঐ ছোকরার দল।

যার নেতা সেই বিদেশী ছোকরা?

সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

একবার ছোকরাকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করো না।

পারবে তুমি তাকে বশ করতে?

চেষ্টার ত্রুটি হবে না। তবে কি জানো ছোকরাগুলোর চেয়ে বুড়োর দল তাড়াতাড়ি মজে। যাই হোক, একবার ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসো।

এমন সময়ে পথে যুবরাজের শিবিকার শব্দ শ্রুত হইল। বক্কনাস বলিয়া উঠিল, ঐ যে যুবরাজ আসছেন, সাবধান।

রমানী চাপা গলায় শুধাইল—বন্যা আসতে আর কত দেরী?

চাপা গলায় বক্কনাস উত্তর দিল, খুব বেশি হয় তো

ছ’মাস। যমুনা পার হয়েছে। সর্বদা গুপ্তচর যাতায়াতে সংবাদ পাচ্ছি।

রমানী বলিল, ইতিমধ্যে মৌখরি ভীতিটাকে জাগিয়ে রেখো।

এখন চুপ করো। ঐ যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বক্কনাস ও রমানী নিজেদের মধ্যে আসন্ন শ্বেতহূন-আক্রমণ ব্যাপারটাকে ‘বন্যা’ নামে অভিহিত করিত।

এমন সময়ে যুবরাজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রমানী ও বক্কনাস নত হইয়া অভিবাদন করিল।

পুরগুপ্ত রমানীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, রমানীর রূপ নিত্য নূতন।

সে রূপের গুণ নয়, চোখের গুণ মহারাজ।

যুবরাজ শব্দটিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

চলুন আপনাকে ও-ঘরে নিয়ে বসাই।

বলিয়া যুবরাজের হস্ত ধরিয়া রমানী গৃহান্তরে প্রস্থান করিল।

সময়জ্ঞ বক্কনাস যুবরাজকে অভিবাদন করিয়াই প্রস্থান করিয়াছে।

একটা দেশের সমস্ত লোক নির্বোধ বা কৃতঘ্ন হইবে এমন সম্ভব হয় না। এই সাধারণ নিয়মের বশেই হোক

বা রমানীর ছলনায় ও বক্কনাসের অর্থে মুগ্ধ না হইবার জন্যই হোক উজ্জয়িনীর একদল লোক শ্বেতহূনগণের আচরণ, উজ্জয়িনীবাহ্লীক মৈত্রীবন্ধন তেমন প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারিল না। ইহারা সকলেই বয়সে তরুণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠাতেও নগণ্য, আর রাজপুরুষ শ্রেণীরও অন্তর্গত নয়। ইতিহাসে পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সর্বদেশে এবং সর্বকালে রাজপুরুষগণই প্রথমে রাজবিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া ওঠে। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। যে নিম্নপদে অধিষ্ঠিত উচ্চপদটা যে তাহারই প্রাপ্য—এই তাহার গুপ্ত অভিযোগ। আবার উচ্চপদস্থের অভিযোগ উচ্চতর পদটা তাহারই প্রাপ্য,—এই ভাবে ধাপে ধাপে অভিযোগের ধারা উঠিতে থাকে—এবং সকলের বাস্তব বা কাল্পনিক অসন্তোষপুঞ্জ বিরাট এক ইন্ধনস্তূপের সৃষ্টি করে। কোথাও হইতে তাহার উপরে একটুখানি স্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়িলেই লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হইয়া যায়। উজ্জয়িনীর রাজপুরুষসমাজও এই মনোভাবের নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল।

কিন্তু যে সব যুবকের কথা বলিতেছি তাহারা না রাজপুরুষ, না সামাজিক মর্যাদাবিশিষ্ট, কাজেই তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের ইন্ধন ছিল না। তাহারা গোপনে, পরোক্ষে, অলক্ষিতে শ্বেতহূনসমাজ ও মৈত্রীবাহিনীর বিরোধিতা শুরু করিয়া দিল। রাত্রির অন্ধকারে তাহারা

সৌধপ্রাচীরে শ্বেতহূনদের সম্বন্ধে সতর্কবাণী বা ধিক্কারবাণী লিখিয়া রাখে, শ্বেতকহ্লার উপহার দিতে আসিলে প্রত্যাখ্যান করে এবং আরও অনেক উপায়ে শ্বেতহূন-সমাজ ও তাহার অনুকূল ব্যক্তিদের প্রতিকূলতা করে। তাহারা গোপনে গোপনে রটাইতে লাগিল যে শ্বেতহূনগণ উজ্জয়িনীর শত্রু আর মৈত্রীবাহিনী বিশ্বাসঘাতক। বলা বাহুল্য এসব কথা বিশ্বাস করিবার লোকেরও অভাব হইল না। সম্ভব, অসম্ভব সকল কথাই বিচার না করিয়া যাহারা বিশ্বাস করে তাহারাই জনসাধারণ।

এই সব যুবক সংখ্যায় নিতান্ত অল্প না হইলেও তাহারা নেতৃহীন, তাই বিচ্ছিন্ন আর আর্থিকসহায় তাহাদের নাই বলিলেই হয়।

এমন সময়ে একদিন এক তরুণ সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইল। সন্ন্যাসী তরুণ, সুপুরুষ, চীরবল্কলধারী। যুবকদের অনেকের চেয়ে তাহার বয়স অল্প। কিন্তু হইলে কি হয় তাহার বাগ্মিতা, অগ্নিগর্ভ বাক্য, মনোরম অথচ তেজঃপুঞ্জ দেহ আর সর্বোপরি তাহার নেতৃত্বশক্তি অচিরে যুবকদের চিত্তজয় করিয়া লইয়া এক উদ্দেশ্যবন্ধনে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিল।

সেদিন সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তে একটি জীর্ণ পরিত্যক্ত অট্টালিকায় যুবকগণ সমবেত হইয়াছে। ক্ষীণ দীপালোকিত

একটি কক্ষে প্রায় জনপঞ্চাশ যুবক উপবিষ্ট, মাঝখানে সেই তরুণ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর হাতে একটি রক্তপদ্ম।

সন্ন্যাসী বলিল—আমাদের সঙ্ঘের নাম রক্তপদ্ম।

এক যুবক বলিল—এ চমৎকার, ওদের শ্বেতকহ্লারের পাল্টা উত্তর!

সন্ন্যাসী বলিল—যারা আমাদের সঙ্ঘভুক্ত হবে তারা সর্বদা একটি করে রক্তপদ্ম ধারণ করবে। তাতে আমরা বুঝতে পারবো কে আমাদের আপন লোক।

একজন বলিল—রক্তপদ্ম বিতরণ করলে কেমন হয়?

এখনো সে সময়ে আসে নি, তাছাড়া যথেচ্ছ বিতরিত হলে দলের সংহতি নষ্ট হবে। আমরা অনেক লোক চাই না, চাই সঙ্ঘবদ্ধ মুষ্টিমেয় লোক।

কিন্তু ওদের লোকসংখ্যা সুপ্রচুর। আমরা ক'জনে কি করতে পারবো?

সন্ন্যাসী। সম্মুখযুদ্ধে অধিক লোকসংখ্যার প্রয়োজন হয়, আমাদের সে শক্তি নেই। আমাদের গোপনে কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

সন্ন্যাসী। যে সব কাজ চলছে তা তো চলবে, আরো কিছু করতে হবে।

আর কি কাজ!

সন্ন্যাসী। ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে। সময় মতো ও আবশ্যক মতো তা আমি তোমাদের জানাবো।

গুপ্তহত্যা উচিত হবে কি?

সন্ন্যাসী। রক্তপদ্মের রঙের মধ্যেই তার উত্তর নিহিত। এখন কেবল ওদের কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু কখনো কি শ্বেতহূন বাহিনীগণ কর্তৃক নগরী আক্রান্ত হবে?

সন্ন্যাসী। সে আশঙ্কা অবশ্যই আছে। মৈত্রীবাহিনী ও শ্বেতহূনগণের প্রভাববিস্তার সমস্তই তার প্রস্তুতি।

তখন আমাদের কি কর্তব্য?

সন্ন্যাসী। ঐ যে বল্‌লাম—ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।

ওদের নেতা বক্কনাস।

অপরে বলিল—কিন্তু সবচেয়ে সর্বনাশা রমানীর প্রভাব। সকলকে ঐ বেটি মুগ্ধ ক'রে হতবীর্য করে রেখেছে।

রমানীর উল্লেখে সন্ন্যাসীর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—সে বলিল, তার ভার আমি নিলাম।

আপনি পুরুষ হয়ে স্ত্রীলোকের উপরে হস্তক্ষেপ করবেন?

সন্ন্যাসী। ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তবে প্রাণে মারবো এমন তো বলি নি।

সভাভঙ্গ হইলে সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। সন্ন্যাসীও প্রস্থান করিল। রক্তপদ্ম সঙ্ঘের যুবকগণ কেহ

সন্ন্যাসীর পরিচয় শুধায় নাই, মনেও ঔৎসুক্য অনুভব করে নাই। সকলেই জানে সন্ন্যাসীর পূর্বাপর নাই, কেবল কর্ম আছে। তাহারা সন্ন্যাসীর কর্মধারাতেই সন্তুষ্ট।

পুষ্যভূতির মৃত্যুর পরে কালিদাস একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন, দৈহিক স্বাস্থ্যে নয় মানসিক ক্ষেত্রে। তিনি এতদিনে স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উজ্জয়িনীর পতন অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন। তিনি স্বনিকেতনের বাহিরে আর যাইতেন না, এমন কি আর্যা শীলবতীর গৃহে যাওয়াও কমাইয়া দিয়াছিলেন।

সেদিন সকালে স্বনিকেতন-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে এক স্থানে একটি সদ্যবিকশিত রক্তপদ্ম পড়িয়া আছে। রক্তপদ্ম কোথা হইতে আসিল ভাবিয়া ফুলটি তিনি তুলিয়া লইলেন। এমন সময়ে নিচুল আসিয়া উপস্থিত। রক্তপদ্মটি দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল—একি আপনার এখানেও রক্তপদ্ম!

কালিদাস বলিলেন—বিস্ময়ের কারণ কি?

ভোর বেলা উঠে দেখি আমার দ্বারের সম্মুখে একটি রক্তপদ্ম। ভাবলাম কেউ ফুল নিয়ে যাচ্ছিল একটি পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

কি সন্দেহ?

কারো ডালা থেকে পড়ে যায় নি—এই সন্দেহ।

তবে এলো কোথা থেকে ?

তাই তো ভাবছি।

এমন সময়ে বিদূষক বসন্তক ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া কালিদাস ও নিচুল বিস্ময়ের সঙ্গে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এ কি তোমার হাতে রক্তপদ্ম এলো কোথা থেকে ?

বিদূষক ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, আপনাদের হাতেও দেখছি রক্তপদ্ম !

আর যা দেখতে পাচ্ছ না তাও আছে। আমার বাড়ীতেও কোথা থেকে একটি ঐ ফুল যেন এসেছে।

কালিদাস বলিলেন—তুমি কোথায় পেলে শুনি ?

তখনো ভোরের অন্ধকার আছে। লোক দেখা যায় অথচ চেনা যায় না এমনি আলোর অবস্থা। কেবল বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়েছি এমন সময়ে একটি লোক হাতে ফুল গুঁজে দিয়েই নিমেষে প্রস্থান করলো।

কালিদাস বলিয়া উঠিলেন—আশ্চর্য।

কেন বলো দেখি ?

আর যাই হোক এ খেয়ালীর বা পাগলের কাণ্ড নয়।

তবে ?

এ সব ফুলের মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে—এবং এর একটা গূঢ় তাৎপর্য থাকাও সম্ভব।

তারপরে নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যাবেলায় তাহারা যখন শীলবতীর কুটীরে মিলিত হইল কালিদাসের ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ বুঝিতে পারা গেল, বুঝিতে পারা গেল যে রক্তপদ্মের নিগূঢ় তাৎপর্য বিদ্যমান, শীলবতীও রক্তপদ্ম পাইয়াছেন; মহাকালের মন্দিরে রক্তপদ্মের গুচ্ছ কে বা কাহারা রাখিয়া আসিয়াছে, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে রক্তপদ্মের গুচ্ছ প্রলম্বিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া বহু নাগরিক অদৃশ্য হস্ত হইতে রক্তপদ্ম উপহার পাইয়াছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই উপহারদাতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপহারদাতা অদৃশ্য থাকিয়া গিয়াছে।

নিচুল ও বিদূষকের মুখে আনুপূর্বিক বিবরণ শুনিয়া কালিদাস বলিয়া উঠিলেন—এ রক্তপদ্ম শ্বেতকহ্লারের প্রত্যুত্তর নয় তো?

সকলে কান খাড়া করিয়া বসিল।

কালিদাস বলিলেন—এর অধিক এখন বল্‌তে পারি না, আর এটুকুও আমার অনুমান। মনে হচ্ছে শ্বেতকহ্লারীগণের একটা প্রতিপক্ষ এতদিনে বুঝি গ'ড়ে উঠ্‌ল। ওদের ভাষা শ্বেতকহ্লার, এদের ভাষা রক্তপদ্ম।

শীলবতী সাবেগে বলিয়া উঠিলেন, আহা তাই যেন হয় মহাকাল, তাই যেন হয়।

নিচুল বলিল, কিছুদিন হ'ল নগরে যে তরুণ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হ'য়েছে তার সঙ্গে এর যোগাযোগ নেই তো?

অসম্ভব নয়।

অনেকদিন পরে কালিদাস ছাড়া আর তিন জনে একটুখানি আনন্দের আভাস অনুভর্ব করিল।

নিচুল বলিল, ন দেব সৃষ্টিনাশায়।

সে কথা সত্য, কিন্তু দেবতার সৃষ্টি তো উজ্জয়িনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

রক্তপদ্ম যদি শ্বেতকহ্লারের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তবু নয়?

প্রায়শ্চিত্তে পাপের ক্ষয় হয়। পাপের ক্ষয়টাই লাভ, পাপী রক্ষা না পেতেও পারে—তাতে দুঃখ করা চলে না।

পাপ পুণ্য মনের বস্তু, রাজনীতির উপরে তার প্রভাব পড়তে যাবে কেন?

পড়তে যাবে না কেন? অপরাধ আর পাপ এ দুটো তো মানুষের মনগড়া ভাগ। যে-নিয়মে ব্যক্তি চালিত হয়, সেই নিয়মের প্রভাবে সমাজ রাষ্ট্র ও দেশ চলছে। ও সবের জন্যে স্বতন্ত্র বিধি ও বিধাতার সৃষ্টি হয়নি। নিচুল একথা নিশ্চয় জেনে রেখো, রাজ্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে যে নিয়মের বশে সেই নিয়মের বশেই খসে পড়ে দরিদ্রতম ব্যক্তির কুটীরের চালখানা। ব্যক্তির পাপে সমাজ ধ্বসে পড়ে, যেমন সমাজ উন্নত হয় ব্যক্তির পুণ্যে। পাপ পুণ্যের মাপকাঠি বর্জন ক'রে সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। তবে তাকে পাপপুণ্য বলবে না সামাজিক ন্যায়বিচার বা তার

অভাব বলবে তাতে কিছু যায় আসে না। বিধাতা মানুষের অভিধানের অধীন নন।

তবে কি উজ্জয়িনীর পতন অবশ্যম্ভাবী?

ঐ যে শিপ্রাগর্ভে ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে তার মতোই অবশ্যম্ভাবী।

তবে আমরা এই মাত্র যে আনন্দ অনুভব করেছিলাম তা অলীক?

না অলীক নয়। মরবার আগে প্রায়শ্চিত্ত করবার শুভবুদ্ধি হয়েছে এই সান্ত্বনায় আনন্দ অনুভব করতে পারো। ধর্মো রক্ষিতো রক্ষতি। উজ্জয়িনী যতদিন ধর্মরক্ষা করে চলেছিল ততদিন ধর্ম তাকে রক্ষা করে চলেছে।

এখন!

কালিদাস সে-প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, নীরবে বসিয়া রহিলেন।

পুষ্যভূতির মৃত্যুর মাস দুই পরে একদিন নগরে রটিয়া গেল যে শত্রু আসিতেছে। শত্রু কে, তাহারা সংখ্যায় কত, কোথা হইতে আসিতেছে কেহই জানে না। কেবল সকলের মুখে রব, শত্রু আসিতেছে, পালাও পালাও, নহিলে রক্ষা নাই। সর্বত্র একটা ভীত শঙ্কিত 'গেল, গেল' ভাব! রক্তপদ্ম সঙ্ঘ গোপনে গোপনে লোককে আশ্বস্ত করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, পালাইয়া বাঁচিতে পারিবে না, তার চেয়ে

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। যুদ্ধ ব্যাপারটা দীর্ঘকালের অনভ্যাসে লোক এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। প্রস্তুত হইবার আহ্বানে তাহারা পরম বিব্রত বোধ করিল। এমন সময়ে মৈত্রীবাহিনী পতাকা ও তূরীভেরী সহকারে সাড়ম্বরে ঘোষণা করিল—মাভৈঃ, শত্রু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। শত্রুকে কাহারা পরাজিত করিল—এই অবান্তর প্রশ্ন লোক তুলিল না। আসন্ন বিপদ কাটিয়া গিয়াছে জানিয়া তাহারা আশ্বস্ত বোধ করিল। তখন মৈত্রীবাহিনী পুনরায় ঘোষণা করিল যে মৌখরিগণ নগর অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে আসিতেছিল। শ্বেতহূনবাহিনী তাহাদের পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছে। আর্যাবর্তে শ্বেতহূনবাহিনীর উপস্থিতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা কেহ শুধাইল না। সকলে শ্বেতহূনসমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিল। লোক বলাবলি করিতে লাগিল আমাদের মহাদণ্ডনায়ক কোন কাজের নয়, শ্বেতহূনবাহিনী ছিল বলিয়াই তো এবার সকলের প্রাণ বাঁচিল। মৈত্রীবাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—কেমন বলিয়াছিলাম না, শ্বেতহূন আমাদের শত্রু নয়, পরম মিত্র। শ্বেতহূনসমাজের প্রতিষ্ঠা বাড়িল, লোক এখন তাহাদিগকেই নগরের প্রকৃত রক্ষাকর্তা মনে করিতে লাগিল।

তারপর দু'চার দিন পরে একদিন প্রভাতে নাগরিকগণ নগর প্রাকারে উঠিয়া লক্ষ্য করিল উত্তর দিগন্ত শত শত, সহস্র সহস্র অশ্বারোহীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জোয়ারের

জলের মতো সেই অশ্ববাহিত বাহিনী দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরকে শুধাইল—এ আবার কাহারা!

জনতার মধ্যে মৈত্রীবাহিনীর লোক ছিল, তাহারা বলিল—আরে দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না—ইহারা আমাদের রক্ষাকর্তা শ্বেতহূনবাহিনী, মৌখরিগণকে বিতাড়িত করিয়া এখন বিশ্রামের জন্য আসিতেছে।

ইহা শুনিয়া লোকে খুশী হইয়া তাহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিল।

শ্বেতহূনবাহিনীর আগমন-বার্তায় মহারাজ বুধগুপ্ত বিচলিত হইলেন। তিনি প্রতিরোধের আদেশ দিলেন। বলাবাহুল্য সে আদেশ প্রতিপালিত হইল না, প্রতিপালিত হইবার কোন কারণও ছিল না। মহাদণ্ডনায়ক মহামাত্য প্রধান রাজপুরুষগণ এমন কি স্বয়ং যুবরাজ পর্যন্ত শ্বেতহূন-সমাজের পৃষ্ঠপোষক। মৌখরি বিতাড়নের জন্য শ্বেতহূন-বাহিনীর প্রতি সকলেই কৃতজ্ঞ। সকলেই বলিল, মহারাজ স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন, রাজনীতির নূতন গতি বুঝিবার শক্তি তাঁহার নাই অতএব তাহার আদেশ শিরোধার্য থাকুক, পালন না করিলেই হইল।

অতএব সেদিন সন্ধ্যার মধ্যেই শ্বেতহূনবাহিনী বিনা প্রতিরোধে নগরে প্রবেশ করিয়া নগরবাসীগণ কর্তৃক স্বাগত ও অভিনন্দিত হইয়া বেশ স্থায়ী হইয়া বসিল। নগরীর নামে

কর্তা যিনিই হোন, প্রকৃত কর্তৃত্ব তাহাদেরই করতলগত হইল। শ্বেতহূনবাহিনীর সেনাপতি হিংচল সবিনয়ে ঘোষণা করিল— আমরা উজ্জয়িনীর বান্ধব ও সেবক। তাহাকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই আমরা মৌখরিগণকে পরাজিত করিয়াছি। এখন বাহিরের ও ভিতরের শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্যেই আমরা উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিব।

আসল কথা মৌখরিগণের আক্রমণ-আশঙ্কা যেমন সত্য, শ্বেতহূনগণ কর্তৃক তাহাদের পরাজয় যেমন সত্য, শ্বেতহূন-গণের মিত্র ও সেবক রূপে উজ্জয়িনীতে অবস্থানও তেমনি সত্য। নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যার মতো সত্য অল্পই আছে।

এমন সময়ে মহারাজ বুধগুপ্তের এক ঘোষণাপত্র বাহির হইল। তাহাতে তিনি শ্বেতহূনবাহিনীকে স্বাগত জানাইয়াছেন—আর প্রকৃতিপুঞ্জের উদ্দেশে প্রচার করিয়াছেন যে এখন তাঁহার বানপ্রস্থের বয়স। তিনি বনে প্রস্থান করিলেন, যুবরাজ পুরগুপ্ত সেই মুহূর্ত হইতে মহারাজ-পদে আসীন হইলেন।

প্রাচীন মহারাজার প্রস্থানে যদি কেহ দুঃখিত হইয়াও থাকে তাহার বেশি খুশি হইল জনপ্রিয় অর্থাৎ শ্বেতহূন সমাজের প্রিয় পুরগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদে।

মহারাজ বুধগুপ্ত কখন্ বনে গেলেন, কোন্ বনে গেলেন কেহ সন্ধান পাইল না। মহারাজকে আর কেহ দেখিতে পাইল না, সকলে ধরিয়া লইল তিনি বনেই গিয়াছেন।

তখন মহারাজ পুরগুপ্তের নামমাত্র কর্তৃত্বে বক্কনাস, রমানী ও হিংচল উজ্জয়িনী শাসন করিতে লাগিল, মহামাত্য, মহাদণ্ডনায়ক প্রভৃতি রাজপুরুষগণ তাহাদের ইচ্ছায় ক্রীড়নকে পরিণত হইল। নগরে সুখ শান্তি ও শ্মশানের নিস্তব্ধতা প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু শ্মশানেও কি নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আছে? ক্রমে নগরে অশান্তি দেখা দিতে লাগিল। কোন দিন বা শ্বেতহূন বাহিনীর ছাউনিতে আগুন লাগে; কোন দিন বা তাহাদের জন্য নীয়মান খাদ্য লুণ্ঠিত হয়; কখনো বা নিঃসঙ্গ শ্বেতহূন অন্ধকারে প্রহৃত হয়; আবার অনেক সময়ে তাহাদের আবাস-নিকেতনের প্রাচীরে নানারূপ অকথ্য তিরস্কার লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক সন্ধান করিয়াও রাজপুরুষগণ অপরাধীর সন্ধান পায় না। হিংচল মহারাজ পুরগুপ্তকে বলে যে, রাজপুরুষগণ অপরাধীদের প্রশ্রয় দিতেছে তাই তাহাদের এত সাহস।

পুরগুপ্ত শুধান—এখন কি কর্তব্য?

হিংচল বলে—আমাদের দেশে যেমন করে তেমনি করুন।

কি করতে হবে বলো।

যে পাড়ায় উপদ্রব হচ্ছে সেই পাড়ার যে-কোন দশজন লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করুন।

কিন্তু এতো ন্যায়বিচার নয়।

যাতে রাজদণ্ড নিরাপদ থাকে তাই ন্যায়বিচার।

আচ্ছা তবে তাই হোক।

উপদ্রুত পাড়ার দশজন লোক রাজাদেশে নিহত হইল। কিন্তু সেই রাত্রেই শ্বেতহূনবাহিনীর একটি বৃহৎ ছাউনি আগুনে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

হিংচল ও বক্কনাস রাজসমীপে আসিয়া বলিল—মহারাজ, এ সব সামান্য আততায়ীর কাজ নয়। এর মূলে আছে রাষ্ট্র-শত্রু মৌখরিগণের ছদ্মবেশী লোক।

পুরগুপ্ত বলিলেন—বেশ তো তাদের খুঁজে বের করো, দণ্ডের ব্যবস্থা করছি॥

তাহারা বলিল—সে কাজ তো মহারাজের।

পুরগুপ্ত বলিলেন—তবে তোমাদের কাজ তোমরা করো—আমাকে আমার কাজ করতে দাও।

মহারাজের কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনিও রাষ্ট্রশত্রুর পক্ষে যোগ দিয়েছেন। বেশ তাই হবে, আমাদের কাজ আমরা করবো।

এই বলিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

পুরগুপ্ত সিংহাসনে বসিয়া রাগে ও অপমানে গজরাইতে লাগিলেন।

সেইদিনই মৈত্রীবাহিনী নগরে প্রচার করিয়া দিল যে মৌখরিগণের অসংখ্য ছদ্মবেশী সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়াছে। মহারাজ তাহাদের বাধা দিতে অক্ষম। কিন্তু

ভয়ের কারণ নাই—আমাদের মিত্র অজেয় শ্বেতহূনবাহিনী আছে।

সে রাত্রি বিভীষিকাময়ী হইল। সারারাত্রি শ্বেতহূন-বাহিনী ও মৈত্রীবাহিনী নগরে অগ্নিসংযোগ, যথেচ্ছ হত্যা ও লুণ্ঠন করিল। যত লোক মরিল, তাহার দশ গুণ নগর ছাড়িয়া পালাইল। পরদিন প্রাতে সুখসৌভাগ্যসমৃদ্ধ উজ্জয়িনী একটি বিরাট শ্মশানরূপে দৃষ্ট হইল। পরদিন কোন কোন প্রজা দুঃখের বার্ত্তা নিবেদনের জন্য রাজপ্রাসাদে গিয়া দেখিল, লুণ্ঠিত, অগ্নিদগ্ধ, হতাহতে স্তূপীকৃত রাজ-প্রাসাদের এক কোণে পুরগুপ্তের মৃতদেহ লুটাইতেছে—তাঁহার বক্ষে তীক্ষ্ণ অসি আমূল নিহিত। প্রজাগণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সেখানে একজন শ্বেতহূন ছিল, সে বলিল—এ মৌখরিগণের কাজ। প্রজাগণ 'হাঁ', 'না' কিছুই বলিল না, সন্দেহ পর্যন্ত করিল না, শ্বেতহূনগণের বিরুদ্ধে সন্দেহ পর্যন্ত করিবার সাহস তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

মৈত্রীবাহিনী নগরে রাষ্ট্র করিল, মহারাজ পুরগুপ্ত মৌখরিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন।

হিংচল বলিল—নূতন মহারাজার অভিষেক সাড়ম্বরে করিতে হইবে কিন্তু যতদিন সে আয়োজন সম্পূর্ণ না হইতেছে ততদিন কি সিংহাসন শূন্য থাকিবে! তা হয় না, বাহ্লীক-রাজ তোড়মানের প্রতিনিধিরূপে আমি তাহাতে আসীন হইলাম। বাহ্লীক রাজ্য উজ্জয়িনীর পরম মিত্র।

মৈত্রীবাহিনী তূরী ভেরী কাড়ানাকাড়া জগঝম্প সহকারে সিংহনাদ করিয়া উঠিল—বাহ্লীকউজ্জয়িনী মৈত্রীবন্ধন চিরস্থায়ী হোক।

সারাদিন সারারাত্রি উজ্জয়িনীতে মহোৎসব নৃত্যগীত শোভাযাত্রা অভিনয় আতসবাজি এমন কত কি হইল। অনেক রাত্রে উৎসবক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া রমানী মণিকুট্টিম প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে বিশ্রাম করিতেছে, প্রাসাদ নির্জন, তাহার সঙ্গিনীগণ তখনো ফেরে নাই এমন সময়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল।

রমানী চমকিয়া উঠিয়া শুধাইল—তুমি কে?

আগন্তুক রয়সে তরুণ, তাহার গাত্রে গেরুয়াবাস, হাতে একটি রক্তপদ্ম।

আগন্তুক কথা না বলিয়া রক্তপদ্মটি তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল।

রমানী বলিল—ও তুমি বুঝি রক্তপদ্ম সঙ্ঘের একজন।

একজন নই আমি নেতা।

তাহার স্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে রমানীকে ভীত করিয়া তুলিল।

সে বলিল—তুমি পুরুষ, তায় সন্ন্যাসী, এত রাত্রে নারীর গৃহে কেন?

কেন! তবে শোনো। নারীর কেশরাশি ছেদন করলে তাকে কেমন দেখতে হয় সেই জন্যে! এবারে বুঝ্‌লে?

কেন এমন অন্যায় অভিলাষ!

অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার মানসে।

কি বল্‌ছ!

তুমি কি কখনো নারীর কেশরাশি ছেদন কর নাই?

রমানীর মনে পূর্বকথা উদিত হইল। একটু নীরব থাকিয়া বলিল—কিন্তু তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

ধরো সে আমার প্রেয়সী!

তুমি সন্ন্যাসী। আর তা ছাড়া সে তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি!

ধরো সে আমিই!

এবারে রমানী হাসিল, বলিল, বৃথা জল্পনা রাখো! তুমি তো পুরুষ।

তবে স্বচক্ষে দেখো।

এই বলিয়া আগন্তুক তাহার গাত্রবাস উন্মোচিত করিল, হীরককঠিন স্বেদোজ্জ্বল স্তনদ্বয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। বলিল, এবারে বিশ্বাস হল রমানী, আমিই মধুবল্লরী।

ভীত রমানীর মুখে বাক্য সরিল না।

আগন্তুক বলিতে লাগিল—আজ তোমাদের অভিসন্ধি পূর্ণ হয়েছে। ছলে বলে কৌশলে জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতায় উজ্জয়িনী আজ তোমাদের পদপ্রান্তে শায়িতা। তাকে রক্ষা

করবার সাধ্য আমার হল না। তাই আজ উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করবো কিন্তু তার আগে—

এই বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা সুতীক্ষ্ণ কাঁচি বাহির করিল।

তার আগে ছিন্নকেশা নারীর সৌন্দর্য দেখে যাবো—

এই বলিয়া উল্লাসে উন্মাদনায় সে হাসিয়া উঠিল।

সন্ত্রস্তা রমানী মূঢ়ের মতো হাসিয়া উঠিল।

তখন মধুবল্লরী আতঙ্কবিকলা রমানীকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়া সবলে তাহার কেশ ছাঁটিয়া দিল। তারপরে সেই ছিন্নকেশের গুচ্ছ তাহার মুখের উপরে ঘৃণায় ছুঁড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু তার আগে রমানীর প্রসাধন কুঞ্চিকা হইতে একখানি দর্পণ আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল, বলিল—একবার মুখখানা দেখো।

এই বলিয়া সে অন্ধকারের মধ্যে প্রস্থান করিল।

রমানীর মোহভঙ্গ হইলে দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখচ্ছবি দেখিয়া তাহার চোখে ধারা নামিল। রাজধানীর বিজয়োল্লাসের পটভূমিতে রমানী একাকী বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

সেইদিনই গভীর রাত্রে শিপ্রাতীরে মহাকাল মন্দিরের কাছে চারটি মনুষ্য মূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল।

একজন বলিল—আর বিলম্ব বিপদের কারণ। শত্রু এসে পড়তে পারে।

সেই ভালো। তা ছাড়া এখানে থাকাও নিষ্প্রয়োজন। উজ্জয়িনী বিজিত, গুপ্তবংশ লুপ্ত, এখানে থাকবার আর কারণ নেই।

বিপদের আশঙ্কাও যথেষ্ট।

তবে যাত্রা করো।

তখন চারজন মহাকাল মন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া লইল—আর ধীরে ধীরে সন্তর্পণে নদীগর্ভে নামিয়া হাঁটুজল নদী পার হইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইল।

নিচুল বলিল, এ পথ অপরিচিত, তায় ঘোর অন্ধকার, কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

শীলবতী বলিলেন—আমার হাত ধরো।

দু'চার পা পরে শীলবতী বলিলেন—আমার চোখেও সব ঘোর ঘোর ঠেকছে।

তবে আমার হাত ধরো, বলিয়া কালিদাস হাত বাড়াইয়া দিলেন।

আবার কিছুক্ষণ চলিবার পরে কালিদাস বলিয়া উঠিলেন—আমিও আর পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

তবে আমার হাত ধরো—এবারে কথা বলিল বসন্তক।

আলঙ্কারিককে পথ দেখাইল তপস্বিনী, তপস্বিনীকে পথ দেখাইল কবি, আর সকলকে পথ দেখাইল বিদূষক। এই ভাবে তাহারা অন্ধকারে অপরিচিত পথে পথ চলিতে লাগিল।

একবার তাহারা থামিল, পিছনে ফিরিয়া তাকাইল, বুঝিল তাহারা যথাসময়ে নগরী পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা দেখিল উৎসবের শেষ আহুতিরূপে তাহাদের চারজনের কুটীর পুড়িয়া যাইতেছে—আর সেই আগুনের পটে, জাগতিক স্পর্শের অনেক উর্ধ্বে রহস্যময় বিধাতার অভয়পাণির মতো মহাকালের অজেয় ত্রিশূলখানি ভাস্বর!

তাহারা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া আবার অন্ধকারের মধ্যে চলিতে লাগিল—তাহাদের যাত্রার লক্ষ্য গিরিদুর্গম দূরবর্তী ধারা নগরী।

সমাপ্ত

গুপ্তগণ সম্পর্কিত

1. R. D. Banerji, Age of the Imperial Guptas, Benaras, 1933
2. K P. Jayaswal, History of India, 150—350 A. D., Lahore, 1933.
3. R. N. Dandekar, History of the Guptas, Poona, 1941.
4. R. N. Saletore, Life in the Gupta Age, Bombay, 1943,
5. V. A. Smith, Early History of India (4th. ed), Oxford, 1924.
6. R. K. Mookerjee, The Gupta Empire.
7. New History of the Indian People, Vol. VI. Ed. R. C. Majumdar and A.S. Altekar, Lahore, 1946
8. The Classical Age (of Indian History). Ed. R. C. Mazumdar, Bharatiya Vidya Bhavan, History and Culture of the Indian People, Vol. III., Bombay, 1954.
9. R. G. Basak, History of North-Eastern India, Calcutta, 1934.
10. J. F. Fleet—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. (Inscriptions of the Early Gupta Kings and their successors), Calcutta. 1888.
11. D. C. Sircar, Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilisation, Calcutta, 1943.
12. J. Allan, Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties (in the British Museum), London, 1914.

13. V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. I., Oxford, 1906.

14. A. S. Altekar, Catalogue of the Gupta Gold coins in in the Bayana Hoard, Bombay, 1954.

15. B. P. Sinha, Decline of the kingdom of Magadha, 1955.

16. S. K. Aiyangar—Studies of Gupta History, (Published as Supplements to the Journal of Indian History, Vols. V and VI).

17. N. N. Das Gupta—On the Successors of Kumaragupta I (B. C. Law Volume, Part I, P. 617)

18. গুপ্ত সাম্রাজ্যকা ইতিহাস—by B. Upadhyaya (in Hindi) 2 Vols, Allahabad, 1939.

19. আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, Ed. T. Ganapati Sastri, Vol. III, Trivandrum. 1925.

20. J. H. Legge—Record of the Buddhistic Kingdoms, being an account of the Chinese Monk Fa-hien's Travels, Oxford, 1886.

21. S. Beal, Si-yu-ki., Buddhist Records of the Western World, translated from the Chinese Hiuen Tsang, 2 Vols., London, 1906.

22. T. Watters, On Yuan Chwang's Travels in India, 2 Vols., London, 1908.

23. দেবী চন্দ্রগুপ্ত নাটক—by বিশাখদত্ত (probably a contemporary of Chandragupta II)—(কেবল অংশ বিশেষ পাওয়া গিয়াছে)।

24. D. C. Ganguly, Early Home of the Imperial Guptas, Indian Historical Quartely, Vol. XIV. pp. 532 ff.

25. D C.Ganguly I. H. Q. XIX. 332 ff.
" " XXI 141 ff.
" " XXII, pp. 28 ff.
" " XXVIII, pp. 386 ff.

26. History of Bengal, Dacca University, Vol. 1, p. 69.

27. New History of the Indian People, Vol. VI.
Ed. R. C. Majumdar, p.p. 129—134.

28. R. C. Majumdar, Proceedings of the Indian History Congress, 15th. Session, Gwalior, pp.......

29. R. C. Majumdar, Journal of the Bihar Research Society, Vol. XXXVIII, 1952, pp. 410—418.

30. Prof. Jagannath, I. H. Q. Vol. XXII, pp. 28 ff.

31. B. P. Sinha, J. Bihar R. S., Vol XXXVII, 1951. pp. 138 ff.

32. B. P. Sinha, J. Bihar R. S., Vol. XXXVIII, 1952, pp 419 ff.

শ্বেতহূন সম্পর্কিত

33. Chavannes—Documents sur les Toukiue Occidentaux, pp. 223 ff.

34. Sir Aurel Stein, White Huns and Kindred tribes in the history of the Indian North-Western Frontier, Indian Antiquary, 1905, pp. 73 ff.

35. Antiquity of the Hunas and their activity in Iran, Bhandarkar Commemoration Volume, pp. 65 ff.

36. Beal, Records of the Western World, I, pp. XV ff, XCIX ff.

37. K. P. Jayaswal, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. XVIII pp. 203 ff.

38. Sten Konow, Indian Historical Quarterly, Vol XII, pp. 532 ff.

39. V. A. Smith, Journal of the Asiatic Society of Bengal, LXIII, p. 186.

40. Cosmas Indicopleustes, Christian Topography (535–547 A.D.)
Eng. tr. by J. W. Mc Crindle, London, 1897. pp. 366, 371-2.

41. New History of the Indian People, Vol. VI, R. C. Majumdar, pp. 193—201.